সায়াদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উম্মে-সালামা (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সম্মুখে রক্তমোক্ষণ রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় হইয়াছে, তিনি নিষেধ করেন নাই।

কোন কোন ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে এবং যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়।

এই বর্ণনা যদি হাদীছরূপে ছহীহ হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রোযা অবস্থায় এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা চাই। ইহাতে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে। কেননা যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় তাহার দুর্বলতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং যে রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে সে মুখের সাহায্যে উহা করিয়া থাকে বলিয়া তাহার রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

অবশ্য যদি কাহারও পূর্ণ আস্থা থাকে যে, তাহার রক্তমোক্ষণ করা হইলে কোনও দুর্বলতা আসিবে না এবং রোযার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না, তবে রোযা অবস্থায়ও সে রক্তমোক্ষণ করিতে পারে।

১০০১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন।

১০০২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে আপনারা রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ অসঙ্গত গণ্য করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না—অবশ্য যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টির আশঙ্কা হয়।

সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা

১০০৩। হাদীছ ঃ ইবনে-আবী-আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক সফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, বিশ্রামের জন্য অবতরণ কর এবং আমার জন্য শরবত তৈয়ার কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, (এফতারের সময় হয় নাই) সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে দ্বিতীয়বার ঐরূপ আদেশ করিলেন; সে ব্যক্তি পুনঃ ঐ উক্তিই করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়বার তাহাকে ঐ আদেশ করিলেন। এইবার সে অবতরণ করিল এবং শরবত তৈয়ার করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা পান করতঃ (এফতার) করিলেন এবং (পূর্ব দিকে) ইশারা করিয়া বলিলেন, ঐ দিক হইতে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে দেখ তখন মনে কর, রোযাদারের এফতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

১০০৪। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হামযা-ইবনে-আমর আছলামী (রাঃ) নামক ছাহাবী যিনি অনেক বেশী রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আমি অধিক রোযা রাখিয়া থাকি; সফরের অবস্থায়ও কি রোযা রাখিব? নবী (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা করিলে না-ও রাখিতে পার।

বাড়ীতে অবস্থানকালে রমযান আরম্ভ হওয়ায় কয়েক দিন রোযা রাখিয়া সফরে বাহির হইলেও সফরে রোযা ভঙ্গের অনুমতি থাকিবে

১০০৫। **হাদীছ** ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য রমজান মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। যখন মক্কার নিকটবর্তী 'কাদিদ' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি রোযা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণও রোযা পরিত্যাগ করিল।

মছআলাহ ঃ—ছোবেহ-ছাদেক তথা রোযা আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে বাড়ীতে অবস্থানরত থাকিয়া অতঃপর সফরে বাহির হইলেও ঐ দিনের রমযানের রোযা রাখা ফরয, সফরের জন্য ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে।

পক্ষান্তরে ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে সফরে বাহির হইয়া পড়িলে সফর অবস্থায় থাকার দরুণ রোযা কাযা করার অনুমতি আছে। কিন্তু সফর অবস্থায়ও দিনের প্রথম দিকে একবার রমযানের রোযার নিয়্যত করিয়া লইলে তৎপর সফরের দরুন ঐ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে। অবশ্য জেহাদের সফর হইলে তাহার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কারণ, জেহাদের সম্মুখীন অবস্থায় দুর্বলতার আশঙ্কায় রোযা ভঙ্গ করা যায়।

উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাটি জেহাদের সফরই ছিল।

১০০৬। **হাদীছ** ঃ—আবুদ্-দারদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (জেহাদের) এক সফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীষ্মের উত্তাপ অতি ভীষণ ছিল। এমনকি, মাথার উপর অন্ততঃ হাত রাখিয়া ছায়া গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ্য হইতেছিল। (তখন রমযান মাস ছিল, কিন্তু) আমাদের মধ্যে একমাত্র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেহই রোযাদার ছিল না।

সফর অবস্থায় অধিক কষ্টের রোযা নিষিদ্ধ

১০০৭। **হাদীছ** ঃ—জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সফরে ছিলেন; এক স্থানে জনতার ভিড় এবং এক ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা দেখিতে পাইলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? সকলেই আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এক

রোযাদার ব্যক্তির বেহুশ হওয়ার ঘটনা। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন— ليس من البر الصيام فى السفر "সফর অবস্থায় (এরূপ অসহনীয় কষ্টের মধ্যে) রোযা রাখা নেক কাজ গণ্য নহে।"

১০০৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সফর করিয়া থাকিতাম। সফর অবস্থায় রোযাদারগণ রোযা ভঙ্গকারীগণকে কোন প্রকার দোষারোপ করিতেন না এবং রোযা ভঙ্গকারীগণও রোযাদারগণকে দোষারোপ করিতেন না।

১০০৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয় উপলক্ষে) মদীনা হইতে মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন; তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। যখন 'ওছফান' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন পানি আনিবার আদেশ করিলেন এবং সকলকে দেখাইয়া পানি পান করিলেন; মক্কায় পৌঁছা পর্য্যন্ত তিনি আর রোযা রাখিলেন না। এই ঘটনা রমজান মাসে ঘটিয়াছিল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সফর অবস্থায় রোযা রাখিয়াছেন এবং ভঙ্গও করিয়াছেন।

সামর্থবান লোককে রমযানের রোযা রাখিতেই হইবে

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় নূতন নূতন অনেকের রোযা অতিশয় কঠিন বোধ হইত। তাই তখন সাময়িক ভাবে এই অনুমতি ছিল যে, রোযা রাখিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখিয়া প্রতি রোযার পরিবর্তে এক জন মিসকিনকে দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়াইয়া দিবে। কোরআন শরীফের আয়াত—

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

ইহার অর্থ কোন কোন মোফাচ্ছের উক্ত বিষয়ের উপরই স্থাপিত করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, উক্ত মছআলাহ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, কিন্তু উহা ঐ সময়েই রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং কোরআন শরীফের একাধিক স্থানে উক্ত মছআলার রহিতকরণ মূলক আদেশ বিদ্যমান আছে। যথা— (১) وان تصوموا خير لكم অর্থাৎ প্রথমে তোমাদিগকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখা বা রোযা না রাখিয়া (তৎপরিবর্তে) ফিদ্‌ইয়া (এক মিসকীনের খোরাক) দানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, এখন তোমাদের জন্য রোযা রাখাই সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে-আবী-লাইলা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু সংখ্যক ছাহাবী আমাদের অনেকের নিকট এই বিবরণ দান করিয়াছেন যে, রমযান শরীফের এক মাসের রোযা ফরয হওয়ার আয়াত নাযেল হইলে উহা লোকদের নিকট কঠিন বোধ হইল; তখন এই অনুমতি দেওয়া হইল যে, শক্তিমান ব্যক্তিও রোযা না রাখিয়া প্রতিদিন এক মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত খাওয়াইয়া দিতে পারে। পরে এই অনুমতি রহিত ও প্রত্যাহার করা হয় এই আয়াত দ্বারা—وان تصوموا خير لكم "তোমাদের জন্য রোযা রাখাই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা হইল।" সেমতে শক্তিমান সকলেই নির্দ্ধারিতরূপে রোযা রাখায় আদিষ্ট হইল।

(২) فمن شهد منكم الشهر فليصمه অর্থাৎ পূর্বে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এখন আদেশ করা হইতেছে যে, "রমযানের মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে।"

ইহার সমর্থনে ইমাম বোখারী (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত অনুমতি যে রহিত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

১০১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি فدية طعام مسكين আয়াত তেলাওয়াত করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, এই আয়াতের মর্ম (فمن شهد منكم الشهر فليصمه—"রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে" আয়াত দ্বারা) মনছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত হইয়া গিয়াছে।

১০১১। হাদীছ ঃ—* ছালামাতুবনুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াত নাযেল হইল—وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين তখন যাহার ইচ্ছা হইত সে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া আদায় করিয়া দিত। পরে পরবর্তী আয়াত নাযেল হইয়া উক্ত আয়াতের মর্মকে মনছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত সাব্যস্ত করিয়া দিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—তফছীরের বিধান শাস্ত্রে একটি বিধান রহিয়াছে যে, কোরআনের কোন আয়াতের আদেশ বা মর্ম সম্পর্কে কোন ছাহাবী উহা মনছুখ বলিয়া উক্তি করিলে তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রাপ্ত বলিতে হইবে। এই সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবনুল-আকওয়া (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের উক্তি নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত দুইটি হাদীছ গণ্য হইবে।

---

* এই হাদীছ খানার ইঙ্গিত ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছখানা ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন।

রমযানের কাযা রোযা আদায় করার নিয়ম

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারও উপর কতিপয় রোযা কাযা থাকিলে দুই একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহা আদায় করিতে পারিবে।

সায়ীদ ইবনুল মোছাইয়েব (রঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন নফল রোযা রাখা—যাহা অতি ফজীলতের রোযা; কাহারও উপর রমযানের রোযা কাযা থাকিলে সে ঐ সময় নফলের পরিবর্তে রমযানের কাযা রোযা আদায় করিবে।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা আদায় করিতে এতদূর বিলম্ব করিয়াছে যে, দ্বিতীয় রমযান উপস্থিত হইয়া গিয়াছে, এই বিলম্বের দরুণ তাহার কোনও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঐরূপ বিলম্বের দরুণ প্রতি রোযার কাযা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে (এক মিছকীনের খোরাক) কাফ্ফারাও দিতে হইবে।

১০১২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সময় সময় আমার উপর রমযানের কাযা রোযা বাকী থাকিয়া যাইত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আমার কর্তব্য পালনে কোন সময় বাধার সৃষ্টি না হয়—উহার জন্য সর্বদা আমার প্রস্তুত থাকার দরুণ ঐ কাযা রোযা আদায় করিতে বিলম্ব হইয়া যাইত; শা'বান মাসে উহা আদায় করিতাম।

হায়েয অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা করিতে হইবে

বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুয্ যেনাদ (রঃ) বলিয়াছেন, শরীয়তের বিধান অনেক সময় সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির উর্দ্ধেও দেখা যাইতে পারে, কিন্তু ইসলামের প্রতি স্বীকৃতি দানের পর উহাকে লঙ্ঘন করার কোন উপায় থাকিতে পারে না। যথা—হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা আদায় করিতে হয়, কিন্তু নামাযের কাযা করিতে হয় না।

এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডে "হায়েজ অবস্থায় কাযা নামায পড়িতে হইবে না"—পরিচ্ছেদে অনুদিত ১২৫ নং হাদীছ খানা বিশেষ অনুধাবণ যোগ্য; তথায় আলোচ্য বিষয়ের সুন্দর যুক্তিও বর্ণিত হইয়াছে।

কাযা রোযা আদায় করার পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, (সম্পূর্ণ রমজান মাসের রোযা কাযা রাখিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে) ত্রিশ ব্যক্তি এক একটি করিয়া রোযা রাখিলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উহার কাযা আদায় হইয়া যাইবে।

১০১৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কাযা রোযা বাকি রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার পক্ষ হইতে সেই রোযা আদায় করিবে।

১০১৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার উপর এক মাসের রোযা কাযা রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে উহা আদায় করিতে পারি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করিয়া দেওয়া আশু প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ আলেমগণের মতে আলোচ্য হাদীছ সমূহে বর্ণিত উত্তরাধিকারি কর্তৃক রোযা আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, ফিদইয়া তথা প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিছকিনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইবে বা ছদকায়ে-ফেতের পরিমাণের বস্তু বা উহার মূল্য গরীবকে প্রদান করিবে।

এফ্‌তারের সঠিক সময়

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সূর্য্য-গোলক অস্তমিত হইলেই এফ্‌তার করিতেন।

১০১৫। হাদীছ ঃ— عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ ۝

অর্থ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন; এই (পূর্ব) দিক হইতে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে এবং ঐ (পশ্চিম) দিক হইতে দিন চলিয়া যায় তথা সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যায় তখনই রোযাদারদের এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়।

সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ্‌তারে বিলম্ব না করা

১০১৬। হাদীছ ঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ মোসলমানগণ এফ্‌তার করার মধ্যে বিলম্ব না করিয়া সময়মত যথাসত্বর এফ্‌তার করিবে তাবৎ তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গল বিরাজমান থাকিবে।

এফ্‌তার করার পর সূর্য্য দেখা গেলে

১০১৭। হাদীছ ঃ— আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা এফ্‌তার করিলাম। এফ্‌তার করার পর সূর্য্য পুনরায় দেখা গেল। হাদীছ বর্ণনাকারীণীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই ঘটনার দিনের রোযার কাযা আদায়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় কাযা হইতে অব্যাহতি আছে কি?

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখা

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল—সে রমজান মাসে দিনের বেলায় শরাব পান করিয়াছিল। ওমর (রাঃ) তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও রোযা রাখিয়া থাকে। অতঃপর তাহার প্রতি ৮০টি বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

১০১৮। হাদীছ ঃ—রুবাইয়্যে বিন্‌তে মোয়া'ওয়েজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার মোহাররমের দশ তারিখ আশুরার দিনটি পূর্ব হইতেই সন্দেহযুক্ত ছিল। কিন্তু দিন আরম্ভ হওয়ার পর ঐ দিনই আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দিনের প্রথম ভাগেই মদীনাবাসীদের মহল্লা সমূহে খবর পাঠাইয়া দিলেন যে, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাই) যে ব্যক্তি সন্দেহের দরুন রাত্র হইতে রোযার নিয়্যত না করিয়া রোযাহীন প্রভাত করিয়াছে (তথা পানাহার করিয়াছে) তাহার কর্তব্য হইবে এই দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার হইতে বিরত থাকা এবং যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়াছে সে তাহার রোযা পূর্ণ করিয়া লইবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী ছাহাবিয়া বর্ণনা করেন (আশুরার রোযার প্রতি এরূপ তাকিদ দেখিয়া) সর্বদা এই রোযাটি আমরা রাখিতাম এবং আমাদের ছেলে-মেয়েদিগকেও রাখাইতাম। এমনকি, এই উদ্দেশ্যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তুলা দ্বারা খেলনা তৈয়ার করিয়া রাখিতাম; খাওয়ার জন্য কাঁদিলে ঐ খেলনা তাহাদিগকে খেলিবার জন্য দিতাম—যেন খেলায় দিন কাটিয়া গিয়া এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়।

রোযা রাখিয়া সূর্য্যাস্তের পরে—রাত্রে পানাহার করা চাই

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—ثم اتموا الصيام الى الليل "ছোবহে-ছাদেকের পর হইতে পরবর্তী রাত্র আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শুধুমাত্র রাত্রি আসা পর্য্যন্তই রোযা রাখার আদেশ; অতঃপর রাত্রেও পানাহার ত্যাগ করতঃ রোযা রাখার বিধান শরীয়তে নাই।

রাত্রিকালের পানাহার ত্যাগ করতঃ লাগালাগি একাধিক রোযা রাখা হইতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, এরূপ করিলে অনর্থক অধিক কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা নিষেধ করিয়াছেন।

শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি ব্যতীত নিজের তরফ হইতে কোন নিয়ম অবলম্বনে কষ্ট ভোগ করাকে মকরূহ ও অপছন্দনীয় গণ্য করা হইয়াছে।

১০১৯। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَاصِلُوْا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ اِنِّيْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى.

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। ছাহাবীগণের মধ্যে কেহ আরজ করিলেন, আপনি ত ঐরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত তোমাদের তুলনা চলে না; আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) প্রদান করা হয়।

১০২০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া মধ্যে ইফতার না করিয়া লাগালাগি রোযা রাখিতে নিষেধ করিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি ঐরূপ লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ন্যায় না। আমার রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হয় যে, আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) দান করা হয়।

১০২১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখা হইতে একাধিকবার সকলকে নিষেধ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি ত ঐরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার ন্যায় তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমার পালনকর্তা আমাকে রাত্রি বেলায় (বিশেষরূপে) পানাহার (-এর শক্তি) দান করিয়া থাকেন। তোমরা সহজ-সাধ্যের আমলে সচেষ্ট থাক।

কোন কোন ছাহাবী বেশী ছওয়াবের আকাংখায় ঐরূপ রোযা হইতে বিরত থাকিলেন না। তখন হযরত (দঃ) ঐরূপ লাগালাগি রোযা রাখা আরম্ভ করিলেন—একদিন চলিল, দুই দিন চলিল অতঃপর ঈদের চাদ উঠিয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, যদি ঈদের চাদ বিলম্বে উঠিত তবে আমি আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত

রোযা চালাইয়া যাইতাম। যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেখাদেখি লাগালাগি রোযা রাখিতেছিল তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য হযরত (দঃ) এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখা

১০২২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বলিলেন, তোমরা (অনাহারে রাত্রি কাটাইয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। যদি কাহারও ঐরূপ করার বিশেষ আকাংখা হয় তবে সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখিতে পার। লোকেরা বলিল, আপনি ত অনাহারে লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ন্যায় নহি; আমার রাত্রি এইভাবে কাটে যে, আমাকে আহার (-এর শক্তি) দানকারী বিদ্যমান থাকে।

বন্ধুকে নফল রোযা ভঙ্গের কসম দেওয়া

১০২৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সালমান (রাঃ) এবং আবুদ-দরদা (রাঃ) উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। (আবুদ-দরদা (রাঃ) বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না।) সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদার স্ত্রীকে বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ বিশ্রী কাপড় পরিধান কর কেন? সে উত্তর করিল, আপনার বন্ধু আবুদ-দরদা দুনিয়ার কোন সম্বন্ধই রাখেন না। (অর্থাৎ আমার পরিপাটির প্রয়োজনই নাই।) ইতিমধ্যেই আবুদ-দরদা (রাঃ) বাড়ী পৌছিলেন এবং স্বীয় বন্ধু সালমান (রাঃ)কে দেখিয়া খানা তৈয়ার করিলেন এবং তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণের অনুরোধ করিলেন। সালমান (রাঃ) আবুদ-দরদা (রাঃ)কে তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি। সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ তায়ালার কসম দিয়া বলিতেছি—রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। আপনি আহার না করিলে আমিও আহার করিব না। আবুদ-দরদা (রাঃ) বন্ধুর কথায় (নফল) রোযা ভাঙ্গিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর যখন রাত্রি হইল আবুদ-দরদা (রাঃ) রাত্রের প্রথম ভাগেই তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন ঘুমাইয়া পড়ুন। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুনরায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন এইবারও সালমান (রাঃ) তাঁহাকে ঘুমাইয়া পড়িতে বলিলেন। যখন রাত্রির শেষ ভাগ উপস্থিত হইল তখন সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠুন। তখন উভয় বন্ধুই তাহাজ্জুদের নামায আদায়

করিলেন। অতঃপর সালমান (রাঃ) আবুদ দরদা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—আপনার উপর আপনার পালনকর্তার হক আছে, আপনার উপর আপনার আত্মার হক আছে এবং আপনার স্ত্রীরও হক আছে, (আপনার মেহমানেরও হক আপনার উপর আছে। অতএব আপনি কোন দিন রোযা রাখুন, কোন দিন রোযাহীনও থাকুন এবং কিছু সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন, কিছু সময় ঘুমাইয়া থাকুন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকটও থাকুন। এইরূপে) আপনি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।

আবুদ-দরদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া সালমান (রাঃ)-এর সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সালমান ঠিকই বলিয়াছে।

শা'বান মাসে রোযা রাখা

১০২৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একাধারে (নফল) রোযা রাখিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত, তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোযাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রমযান শরীফ ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসের ন্যায় এত বেশী (নফল) রোযা অন্য কোন মাসে রাখিতে দেখি নাই।

১০২৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা অন্য কোন মাসে রাখিতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় সম্পূর্ণই রোযা রাখিতেন।

তিনি স্বীয় উম্মতকে পরামর্শ দানে বলিতেন, (নফল) আমল তোমাদের জন্য যে পরিমাণ সহজ-সাধ্য হয় উহা সেই পরিমাণই অবলম্বন করিবে। আল্লাহ তায়ালা (বেশী আমলের) ছওয়াব দানে অপারগ হইবেন না, কিন্তু (বেশী আমল অবলম্বন করিলে শেষ পর্যন্ত) তোমরাই উহা হইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নফল নামায ঐ পরিমাণই পছন্দ করিতেন যে পরিমাণ সর্বদা আদায় করা যায়—যদিও উহা পরিমাণে কম হয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি কোন সময় নামায পড়িলে (শুধু দুই-একদিন পড়িয়াই উহা ত্যাগ করিতেন না, বরং) সর্বদা ঐ সময় নামায আদায় করিতেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নফল রোযা রাখার নিয়ম

১০২৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযান ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতেন না।

নবী (দঃ) একাধারে রোযা রাখিয়া যাইতেন, এমনকি প্রত্যেকেই ধারণা করিত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোযাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি ধারণা হইত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না।

১০২৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একাধারে রোযা ছাড়া আরম্ভ করিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা রাখিবেন না। আবার একাধারে রোযা রাখা আরম্ভ করিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা ছাড়িবেন না।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তুমি রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে এবং নিদ্রা অবস্থায় দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।

১০২৮। হাদীছ ঃ—হোমায়েদ (রঃ) নামক তায়েবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একই মাসের মধ্যে তাঁহাকে রোযা অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম এবং রোযাহীন দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম। (অর্থাৎ হযরত (দঃ) প্রতি মাসের কিছু দিন রোযা রাখিতেন এবং কিছু দিন রোযাহীন কাটাইতেন।) রাত্রে তাঁহাকে তাহাজ্জুদ রত দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম এবং নিদ্রাবস্থায় দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম। (অর্থাৎ রাত্রের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়িতেন এবং কিছু অংশ নিদ্রায় কাটাইতেন।) কোন প্রকার সিল্ক বা রেশম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাত অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই। কোন প্রকার মুশ্‌ক-কস্তুরী বা আম্বর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুগন্ধের তুলনায় অধিক সুগন্ধ পাই নাই।

নফল রোযা রাখিতে দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

১০২৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল-আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে বিশিষ্ট কুলীন বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা পুত্রবধুর খোঁজ-খবর লইয়া থাকিতেন; তাহাকে তাহার স্বামী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিতেন। পুত্রবধূ তাহার স্বামী (তথা আমার সম্পর্কে) বলিত, মানুষ হিসাবে তিনি খুবই ভাল মানুষ; তবে আমার বিছানায়ও আসেন না, আমার পর্দায়ও হাত লাগান না—যাবৎ তাঁহার নিকট আসিয়াছি এই অবস্থাই চলিয়াছে। আমার পিতা বহুবার এই অভিযোগ শুনিলেন; একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উহার আলোচনা করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।

এতদ্ভিন্ন আমি বলিয়া থাকিতাম, আল্লার কসম—যত কাল বাঁচিয়া থাকি প্রতি দিন রোযা থাকিব এবং প্রতি রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া কাটাইব। এই কথার সংবাদও নবী (দঃ)কে

জ্ঞাত করাইল। তদুপরি আমি যে, সর্বদা রোযা রাখি এবং সারা রাত্র নামায পড়ি—এই খবরও নবী (দঃ) পাইলেন। তারপর নবী (দঃ) আমার নিকট লোক পাঠাইলেন অথবা আমিই হযরতের খেদমতে পৌছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সংবাদ পাইয়াছি—তুমি সর্বদা রোযা রাখিয়া থাক, রোযা একদিনও ছাড় না এবং সারা রাত্র নামায পড়িয়া থাক, নিদ্রা যাও না। আমি আরজ করিলাম, জি-হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, জীবনী শক্তি লোপ পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি সারা বৎসর রোযা রাখে তাহার রোযা যেন হয়ই না। (কারণ, সর্বদা রোযা রাখা শরীয়তে অপছন্দনীয়।) হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোযা কিভাবে রাখিয়া থাক? আরজ করিলাম, প্রতি দিন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন কিভাবে পড়—(কত রাত্রের তাহাজ্জুদে কোরআন খতম করিয়া থাক?) আরজ করিলাম, প্রতি রাত্রে এক খতম করি। নবী (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নাকি বলিয়া থাক, আল্লার কসম—যতদিন বাঁচি প্রতি দিন রোযা রাখিব, সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া কাটাইব। আমি আরজ করিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার চরনে উৎসর্গ—আমি ইহা বলিয়াছি।

(এইরূপে একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) নিজে হযরতের খেদমতে হাজির হইলে হযরত মোটামুটি কথাবার্তা এবং সংক্ষিপ্ত নছিহত করণ হইল। অতঃপর বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া আর একদিন স্বয়ং হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে তশরীফ আনিলেন (ফতহুলবারী ৪—১৭৭)। যাহার বিবরণে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমার রোযার আধিক্যের চর্চা হইলে একদা হযরত (দঃ) আমার গৃহে তশরীফ আনিলেন। আমি হযরতের জন্য একটি গাও-তাকিয়া উপস্থিত করিলাম, যাহা খাজুর-ছোবরা ভর্তি চামড়ার তৈরী ছিল। হযরত (দঃ) মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন এবং তাকিয়াটি হযরতের ও আমার মধ্যস্থলে থাকিল। (দুই দিনের সর্বমোট কথোপকথন এবং হযরতের নছিহত নিম্নরূপ ছিল—)

হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি ঐরূপ করিও না, তুমি উহা নির্বাহ করিতে পারিবে না। তোমার লক্ষ্য রাখা উচিৎ তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক আছে, তোমার উপর তোমার জানের হক আছে, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার বালবাচ্চা আত্মীয়-স্বজনের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে। তুমি বয়স বেশী পাইতে পার; (বৃদ্ধ বয়সে এত অধিক এবাদৎ চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।) অতএব তুমি কিছু দিন রোযা রাখ এবং কিছু দিন রোযাহীন থাক; (রাত্রে) কিছু সময় নামায পড় এবং কিছু সময় নিদ্রা যাও।

(তদুপরি হযরত (দঃ) ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রত্যেকটি বিষয়ের সহজ পরিমাণের পরামর্শ দিলেন। রোযা সম্পর্কে বলিলেন—) প্রতি মাসে তিনটি করিয়া (নফল) রোযা রাখ; নেক কাজে প্রতিটায় দশ নেকী; অতএব (তিনে ত্রিশ এই হিসাবে) প্রতি মাসে তিন রোযাই সারা বৎসরের রোযার ন্যায় হইয়া যাইবে। তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিন রোযা যথেষ্ট নয়? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আরও অধিক সক্ষম, হযরত (দঃ) বলিলেন, পাচটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, সাতটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, নয়টি। আমি বলিলাম ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, এগারটি! এইভাবে আমি কঠোর আমল অবলম্বন করিতে চাহিলাম; অগত্যা আমাকে কঠোর আমলের অনুমতি দেওয়া হইল। এক পর্য্যায়ে হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, একদিন রোযা, দুইদিন রোযাহীন। আমি বলিলাম, আমি আরও বেশী সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিন রোযা। আমি আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলাম; আমাকে কঠোর ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হইল— আমি বলিলাম, আরও বেশী পরিমাণে আমি সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযা রাখ। জিজ্ঞাসা করিলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কিরূপ ছিল? হযরত (দঃ) বলিলেন, বৎসরের অর্দ্ধেক; উহা সর্বোত্তম রোযা। জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীন থাকিতেন। (এইভাবে তিনি রোযার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিও অক্ষুন্ন রাখিতেন, ফলে আল্লার রাস্তায় জেহাদের পূর্ণ শক্তিমান থাকিতেন—) শত্রুর মোকাবিলা হইলে কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না।

এইভাবে বাড়াইতে বাড়াইতে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমিও একদিন রোযা রাখ একদিন রোযাহীন থাক। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লার নবী! ঐরূপ জেহাদের গুণ আমি কোথা হইতে পাইব। (রোযার মধ্যেই) আরও অধিক ও উত্তম ব্যবস্থার শক্তি আমার আছে; হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা হইতে উত্তম আর কোন স্তর নাই! নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি সদা রোযা রাখে (উহা এতই অপছন্দনীয় যে,) সে যেন রোযা রাখে নাই—এই কথা নবী (দঃ) দুইবার বলিলেন।

(রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের পরিমাণ সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, দাউদ (আঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামায আল্লার নিকট সর্বাধিক মাহবুব ও পছন্দনীয়। দাউদ(আঃ) অর্ধ রাত্র ঘুমাইতেন, অতঃপর রাত্রের তৃতীয়াংশ পরিমাণ তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, তারপর আবার ষষ্ঠাংশ পরিমাণ ঘুমাইতেন (৪৮৬ পৃঃ)।

(কোরআন শরীফ খতম সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (তাহাজ্জুদ নামাযে কোরআন শরীফ ধীরে ধীরে এবং সারা

রাত্রের স্থলে অল্প পড়িবে—এক মাসে একবার কোরআন শরীফ খতম করিবে। আমি আরজ করিলাম, আমার আরও অধিক সামর্থ আছে। সেমতে হযরত (দঃ) কোরআন খতমের সময়ের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে সর্বশেষে বলিলেন, তিন রাত্রে খতম করিবে। কিন্তু পরে আবার বলিয়াছেন, কোরআন সাত রাত্রে একবার খতম করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক (তাড়াতাড়ি এবং বেশী) পড়িবে না (৭৫৬ পৃঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, আমার জন্য কতই না ভাল হইত যদি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহজ করার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিতাম। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, দুর্বল হইয়া গিয়াছি, (যে কঠোর আমলের অনুমতি আমি চাহিয়া লইয়াছিলাম উহা নির্বাহ করা এখন আমার জন্য অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কোরআন শরীফের সপ্তমাংশ যাহা শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদে পড়িবেন তাহা দিনের বেলা ইয়াদ করিয়া পরিবারের কাহাকেও শুনাইতেন যেন রাত্রে সহজে পড়িতে পারেন। রোযার ব্যাপারেও যদি (অধিক দুর্বলতা অনুভবের কারণে) শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ করিতেন তবে (একদিন পর একদিন রোযা না রাখিয়া) ধারাবাহিক কয়েকদিন রোযাহীন থাকিতেন, কিন্তু একদিন পর একদিন রোযার হিসাবে ঐ দিনগুলিতে পরিত্যক্ত রোযার সংখ্যা গণিত রাখিতেন এবং পরে ঐ পরিমাণ সংখ্যা ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া পূর্ণ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহা অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন যে, নবী (দঃ) তাঁহাকে যে পরিমাণ এবাদৎ বন্দেগীর উপর রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই পরিমাণের কিঞ্চিতও ছাড়িবেন (৭৫৫ পৃঃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—ছাহাবীগণের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ছিল, দ্বীন ও এবাদতের যে অবস্থা ও পরিমাণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অবলম্বন করিয়াছিলেন হযরতের তিরোধানের পরও যেন সেই অবস্থা ও পরিমাণ অক্ষুন্ন থাকে, উহাতে বিন্দুমাত্র নিম্নগতি না আসে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নফল এবাদৎ অবলম্বন করতঃ সর্বদা নির্বাহ করিয়া চলার প্রচেষ্টা উত্তম প্রচেষ্টা। হাদীছ শরীফে আছে—নফল এবাদৎ ঐ পরিবাণ উত্তম যাহা সর্বদা নির্বাহ করা হয়। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্যেই হযরত (দঃ) নফল এবাদতের পরিমাণে সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্য ছাহাবীগণকে তাকিদ করিতেন। কারণ, সহজ ও কম পরিমাণের এবাদতও উক্ত প্রচেষ্টার পন্থায় বেশীতে পরিণত হয়।

এই আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, উল্লিখিত হাদীছে এবাদৎ কম করার যে শিক্ষা ও পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র সর্বদার অভ্যাসরূপে নফল এবাদত অবলম্বন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ যাহারা আবদুল্লাহ ইবনে আমর

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় বজ্রকঠিন শপথ তুল্য অভ্যাস অবলম্বন করা ত দূরের কথা কোন স্তরেই নফল এবাদতের অভ্যাসই হয় না, বরং সাময়িক মনের কোন গতির প্রভাবে বা সুদিন সুরাত্রির সুযোগে নফল এবাদৎ করা ভাগ্যে জুটিয়া থাকে—এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য উক্ত শিক্ষা ও পরামর্শ নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাময়িক উচ্ছাসকে উত্তম সুযোগ গণ্য করিয়া উহার ধাক্কায় যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় এবং যত অধিক সুযোগ গ্রহণ করা যায় তাহাই সৌভাগ্যের অবলম্বন পরিগণিত হইবে।

তদ্রূপ যাঁহারা পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝিতে সক্ষম তাঁহাদের বিশেষ কর্তব্য নামাযে বা সাধারণ রূপে কোরআন তেলাওয়াত করিতে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং পবিত্র কোরআনের মর্মকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করিয়া উহার ভাবে ভাবান্তরিত হইয়া পাঠ করা। তাহাতে নিশ্চয়ই পঠনের গতি ধীর ও মন্থর হইবে। উল্লিখিত হাদীছে কোরআন তেলাওতের পরিমাণে যে পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র এই দৃষ্টির ভিত্তিতেই। অতএব যাহারা অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত তাহাদের জন্য এই পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যকীয় নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও শুদ্ধ এবং স্পষ্টরূপে পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্যথায় পবিত্র কোরআনের লা'নত ও অভিশাপগ্রস্ত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ঘটনা ছাহাবীগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকেই অধীর হইয়া তাঁহার এই হাদীছ শুনিবার জন্য আসিতেন; তিনিও হযরতের অমোঘ আদর্শের শিক্ষাটিকে অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি পূর্ণ বিবরণটি খণ্ড খণ্ডরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন খণ্ড তাহাও নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন; ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্য রচনায় কিম্বা বিবরণ ধারায় গরমিলের ধারণা জন্মে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণের সমষ্টির মধ্যে মোটেই কোন গরমিল নাই। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বিভিন্ন বর্ণনার হাদীছ সমূহ বোখারী (রঃ) ১৫৪, ২৬৫, ৪৮৫, ৭১৬, ৭৮৩, ৯০৫ ও ৯২৮ পৃষ্ঠায় সর্বমোট ১৮ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব সমষ্টির অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে একত্রে করা হইয়াছে।

কাহারও সাক্ষাতে যাইয়া তাহার খাতিরে নফল রোযা ভঙ্গ করা আবশ্যক নহে

১০৩০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমার মাতা) উম্মে-ছোলায়েমের গৃহে তশরীফ আনিলেন। উম্মে-ছোলায়েম তৎক্ষণাৎ কিছু খুরমা ও মাখন উপস্থিত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মাখন ও খুরমা স্ব স্ব পাত্রে রাখিয়া দাও; আমি রোযা রাখিয়াছি। অতঃপর নবী (দঃ) গৃহের এক কিনারায় দাঁড়াইয়া নফল নামায পড়িলেন এবং উম্মে-ছোলায়েম ও

তাঁহার গৃহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন। উম্মে ছোলায়েম আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার এক জন বিশেষ প্রিয় পাত্র আছে। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন সে কে? উম্মে ছোলায়েম বলিলেন, আপনার আজ্ঞাবহ খাদেম—আনাছ।

(আনাছ (রাঃ) বলেন—) তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার জন্য ইহ-পরকালের সমুদয় কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নতির দোয়া করিলেন এবং এই দোয়াও করিলেন—হে আল্লাহ। আনাছকে ধনে-জনে বাড়াইয়া দাও। সেই দোয়ার বরকতেই আমি মদীনা-বাসীদের মধ্যে অন্যতম ধনী এবং আমার বড় মেয়ে উমায়মা বলিয়াছে, যে বৎসর হাজ্জাজ বছরার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসে সেই বৎসর পর্য্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা একশত কুড়িরও অধিক ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উম্মে-ছোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এতীম ছেলে ছিলেন আনাছ (রাঃ)। মাতা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বারা স্বীয় এতীম পুত্রের জন্য দোয়া করাইলেন। সেই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইল। উহারই দুইটি নমুনা আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে। ধনের দিক দিয়া তাঁহার অসাধারণ উন্নতি লাভ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, সাধারণতঃ খেজুর গাছে বৎসরে একবার ফল আসিয়া থাকে, কিন্তু আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেজুর বাগানের গাছ সমূহে প্রতি বৎসর দুইবার ফল আসিত। জনের দিক দিয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এরূপ উন্নতি দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ৮০।৮২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জীবিত ছেলে-মেয়ে পৌত্র-পৌত্রির সংখ্যা প্রায় একশত ছিল এবং শুধু ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা মৃত এক শত কুড়িরও অধিক ছিল। এই বয়সের পরে তিনি আরও প্রায় ১০।১৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

প্রতি মাসের শেষভাগে রোযা রাখা

১০৩১। হাদীছ ঃ—ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি (তোমার অভ্যাসানুরূপ) গত শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রাখ নাই? ছাহাবী উত্তর করিলেন না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে উহার পরিবর্তে দুইটি রোযা করিয়া নিও।

ব্যাখ্যা ঃ—ব্যক্তিগত নফল এবাদত বন্দেগীতে সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অতি সুফলদায়ক হয় যে, এবাদত সমূহের মধ্য হইতে স্বীয় শক্তি ও সামর্থানুযায়ী কিছু পরিমাণ এবাদত স্বীয় অভ্যস্ত করিয়া লওয়া চাই। অতঃপর সেই অভ্যাসকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করা চাই। এরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সেই মানুষকে অলসতা অবহেলা বা অমনো-যোগিতার মধ্যে ফেলিবার সুযোগ পায় না এবং কোন প্রকার ছুতা-নাতার আড়ালে

তাহাকে এবাদত হইতে মাহরুম রাখিতে সক্ষম হয় না। এই উদ্দেশ্যেই এবাদত-বন্দেগীর উন্নতিকামীগণ নফল এবাদতের কিছু পরিমাণকে স্বীয় আজিফারূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেন। এমনকি, যদিও নফল এবাদতের ক্বাযা আদৌ আবশ্যকীয় নহে তবুও তাঁহারা এরূপ করেন যে, যদি কোন দিন কোন সময় ঐ অজিফা ও নির্দিষ্ট এবাদত কোন বিশেষ কারণে সময় মত আদায় করা না যায়, তবে উহাকে অন্য সময় আদায় করিয়া লন। ইহাতে নফছ-শয়তান কর্তৃক অবহেলা, অমনোযোগিতা ও অলসতা টানিয়া আনার ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে। যেমন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত যে, কাহারও তাহাজ্জুদ বা রাত্রের কোন অজিফা কোন দিন ছুটিয়া গেলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে উহা আদায় করিয়া নিবে। এরূপ আরও অনেক নজীর বিদ্যমান আছে। বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই শা'বান মাসের শেষভাগে নফল রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ নিয়ম হইতে প্রতি মাসের শেষ ভাগে রোযা রাখার অভ্যস্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। যাহার বিবরণ ৯৮৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনাটি এই শ্রেণীরই একটি ঘটনা। ঐ ছাহাবী স্বীয় অজিফা স্বরূপ এই অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের শেষ ২।৩ দিন নফল রোযা রাখিতেন। শা'বান মাসের শেষভাগে সাধারণতঃ নফল রোযা নিষিদ্ধ হইলেও পূর্বাপর মাসসমূহের শেষভাগে নফল রোযা রাখায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা নিষিদ্ধ নহে। আলোচ্য ঘটনায় ঐ ছাহাবী যে কারণেই হউক শা'বান মাসে স্বীয় অভ্যস্ত রোযা আদায় করেন নাই; তাই হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে স্বীয় অজিফা বহাল রাখার প্রতি তৎপরতা শিক্ষাদানার্থে এই পরামর্শ দিলেন যে, অন্য মাসে এই রোযা আদায় করিয়া লও।

মছআলাহ ঃ—আইয়্যামে বীজ তথা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখাও বিশেষ ফজিলতের আমল। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম খণ্ডে অনুদিত ৬২৩ নং হাদীছখানা বয়ান করিয়াছেন।

শুধু শুক্রবার রোযা রাখার অভ্যাস নিষিদ্ধ

১০৩২। হাদীছ ঃ—মোহাম্মদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জাবের (রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি শুক্রবার রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ—শুধুমাত্র শুক্রবার দিন বিশেষ করিয়া রোযা রাখা নিষেধ করিয়াছেন।

১০৩৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন বিশেষ করিয়া শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে, যাবৎ না উহার সঙ্গে পূর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা রাখে।

১০৩৪। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন জোয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন, আমি সেদিন রোযা রাখিয়াছিলাম। তিনি (তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকল্যও রোযা রাখিয়াছিলে কি? আমি উত্তর করিলাম—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামীকল্য রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ কর কি? আমি আরজ করিলাম—না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ অবস্থায় তুমি অদ্যকার রোযা ভাঙ্গিয়া ফেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুক্রমে তিনি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—শয়তান বড় চতুর ও দূরদর্শী। যাহাকে দীনদার পরহেজগার দেখে তাহাকে সেই পথেই ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। শরীয়তের বিধানে যে কার্য্য-বিধি বিদ্যমান নাই, শুধু মনগড়ারূপে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরা যদিও সেই কার্য্য-বিধি ভাল কাজ সংশ্লিষ্ট হয় তবুও এরূপ করা দ্বীন-ইসলামের মূলে ভীষণ আঘাত হানার একটি চিরাচরিত সূত্র ও ছিদ্রপথ। এই সূত্র ও ছিদ্রপথেই পূর্বেকার নবীগণের শরীয়তের মধ্যে তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তন ও বিকৃত করণ ঘটিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হইয়াছে যে, কোন প্রকারে যেন ঐ সূত্র ও ছিদ্রপথের অবকাশ সৃষ্টি হইতে না পারে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহটি সেই বিশেষ দৃষ্টিরই একটি প্রতিক্রিয়া। শুক্রবার দিনটি দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তের মধ্যে ফজীলতের দিনরূপে ধার্য্য হইয়াছে এবং উহার মধ্যে এবাদৎ করার বিশেষ ছওয়াব আছে। কিন্তু এই দিনের জন্য বিশেষ এবাদৎ যাহা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা হইল জুমার নামায। যেরূপ রমযান শরীফের জন্য বিশেষ এবাদৎ ফরজ রোযা ও তারাবীহ এবং আশুরা, আরাফার তারিখ, শাওয়াল মাসের ছয় দিন, প্রতি মাসের আইয়্যামে-বীজ ইত্যাদি অনেক অনেক দিনে নফল রোযা বিশেষ এবাদতরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু শুক্রবারের জন্য নফল রোযা শরীয়ত কর্তৃক বিশেষ এবাদতরূপে প্রবর্তিত হয় নাই। এমতাবস্থায় নফল রোযাকেও জুমার নামাযের ন্যায় শুক্রবার দিনের বিশেষ এবাদতরূপে গণ্য করা দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তকে বিকৃত করণের একটি পদক্ষেপ বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? যদি কেহ ঐরূপ কোন ধারণা অন্তরে স্থান না দিয়া শুক্রবারের রোযা অবলম্বন করে তবুও তাহা নিষেধ করা হইবে। কারণ, আন্তরিক ধারণা দৃষ্টিগোচর হয় না, কার্য্যক্রমের প্রতিই বাহ্যিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বিশেষরূপে শুক্রবার দিন রোযা রাখিলে ঐ ধারণারই সূত্রপাত হইবে এবং সাধারণ্যে তাহার কার্য্যের দ্বারা ঐ ধারণা বিস্তার লাভ করিবে। তদুপরি শয়তান তাহার

দ্বারা আরও বহু স্থানে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করাইবার ছিদ্রপথ পাইয়া বসিবে এবং ধাপে ধাপে দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার সুযোগ করিয়া দিবে।

বলাবাহুল্য শরীয়ত ও দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে শুক্রবার দিনের বিশেষত্ব ও ফজীলত বিদ্যমান আছে। সেই বিশেষত্ব ও ফজীলতের ভিত্তিতেই উপরোল্লিখিত ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা উজ্জ্বল ও প্রবল হইয়া উঠে। অন্যান্য দিনের যেহেতু সেই বিশেষত্ব ও ফজীলত নাই, তাই সে স্থলে ঐ ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা অতি দুর্বল। যেরূপ কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা, বিশেষত্ব ও প্রাধান্য থাকিলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য করা হয়। আর যে ব্যক্তির মধ্যে সেই বিশেষত্ব নাই তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হয় না।

অবশ্য শুক্রবার দিন বিশেষ ফজীলতের দিন, ঐ দিন রোযা রাখার অভিলাষ জন্মিলে তাহা পূরণ করারও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, উহার পূর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা সংযোগ করিবে, যাহাতে উল্লিখিত ধারণা জন্মিবার সূত্র নিপাত হইয়া যায়। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছে ইহারই নির্দেশ রহিয়াছে।

কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা

১০৩৫। হাদীছ ঃ—আলকামা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি স্বীয় (স্থিরকৃত) আমলের প্রতি পাবন্দী ও স্থিতিশীলতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার ন্যায় আমল করার সামর্থ কাহারও আছে কি?

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিতেন না, সাধারণতঃ তাঁহার অভ্যাস ইহাই ছিল। অবশ্য কোন কোন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সপ্তাহের মধ্যে এই দুই দিন প্রত্যেকের আমল-নামা (ইল্লিয়ীনের—নেককারদের আমল-নামা রাখার স্থানের প্রতি) উঠানো হয়। আমি ভালবাসি যে, আমি রোযা অবস্থায় আমার আমল-নামা উঠানো হউক।

ইয়াওমে-আরাফা ৯ই জিলহজ্জের রোযা

১০৩৬। হাদীছ ঃ—উম্মুল মোমেনীন মাইমুনাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়হজ্জে) আরফার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযা সম্পর্কে লোকদের দ্বিধাবোধ হইল। আমি দুধের পেয়ালা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিলাম: নবী (দঃ) তখন আরফার ময়দানের বিশেষ স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। নবী (দঃ) ঐ দুগ্ধ প্রকাশ্যে পান করিলেন, উপস্থিত লোকগণ তাহা অবলোকন করিয়াছিল।

মছআলাহ ঃ—৯ই জিলহজ্জকে ইয়াওমে-আরফা বলা হয়, কারণ সেদিন হাজীগণ আরফার ময়দানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দিনের রোযা বিশেষ ফজিলত ও ছওয়াবের রোযা। কিন্তু হাজী—যাহারা আরফার ময়দানে উপস্থিত আছেন তাহাদের জন্য ঐ দিনের রোযা সুন্নত নহে।

মছআলাহ ঃ—আলোচ্য ফজীলতের রোযাটি বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চলে তথায় জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা হিসাবে ৯ তারিখের জন্য সাব্যস্ত। মক্কা শরীফের ৯ তারিখ তথা প্রকৃত আরাফার দিনকে অন্য অঞ্চলে সাব্যস্ত করিলে তাহা ভুল হইবে। এবং ঐ হিসাবে অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা অনুসারে ৯ তারিখ ভিন্ন অন্য তারিখে রোযা রাখিলে এই ফজীলত লাভ হইবে না।

ঈদের দিন রোযা রাখা

১০৩৭। হাদীছ ঃ—আবু ওবাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এক ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—রমযানের রোযার শেষে ঈদের দিন এবং কোরবানীর গোশত খাওয়ার ঈদের দিন।

১০৩৮। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই কার্য্যগুলি নিষেধ করিয়াছেন—রোযার ঈদের দিনে এবং কোরবানীর দিনে রোযা রাখা, চাদর এরূপে গায়ে দেওয়া যে, হাত বাহির করা কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়ে, (লম্বা) জামার নীচে পায়জামা ইত্যাদি অন্য কোন কাপড় না থাকা অবস্থায় হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যে, তলদেশ উন্মুক্ত থাকে। আর ফজর ও আছর নামায পড়ার পর (নফল) নামায পড়া।

১০৩৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষ হইতে) দুই প্রকার রোযা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—রোযার ঈদের দিনের রোযা ও কোরবানীর ঈদের দিনের রোযা এবং দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—ক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তু হাতে ছোয়াকে এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয় বস্তু ক্রেতার উপর নিক্ষেপ করাকে বাধ্যতামূলক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা।

অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার খর্বকারক সূত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

১০৪০। হাদীছ ঃ—যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ-ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি

যদি কোন বিশেষ দিনের রোযা রাখার—যেরূপ নির্দিষ্ট সোমবার রোযা রাখার মান্নত করে এবং ঐ দিন ঈদের দিন হইয়া পড়ে তবে সে কি করিবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন আল্লাহ তায়ালা মান্নত পূরণ করার আদেশ করিয়াছেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিনে রোযা নিষেধ করিয়াছেন। (শরীয়তের উভয় আদেশ-নিষেধকেই রক্ষা করিতে হইবে।)

মছআলাহ ঃ—এইরূপ মান্নতের দ্বারা রোযা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু ঈদের দিন রোযা রাখিবে না, ঈদের পর অন্য কোন দিন রোযা আদায় করিবে।

মছআলাহ ঃ—কোরবানীর ঈদের দিনের পরে ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখায় মতভেদ আছে। হানফী মজহাব মতে এই তিন দিনেও রোযা নিষিদ্ধ। এই দিনে রোযার মানত অন্য দিনে আদায় করিতে হইবে।

আশুরার—মোহরমের দশ তারিখের রোযা

১০৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আশুরার দিন বলিলেন, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দিন রোযা রাখিতে পারে।

১০৪২। হাদীছ ঃ— عن حميد انه سمع معاوية يقول سمعت رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهٗ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

অর্থ—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—এই যে আশুরার দিন, এই দিনের রোযা তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি এই দিন রোযা রাখিব। যাহার ইচ্ছা হয় সে এই রোযা রাখিতে পারে এবং কাহারও ইচ্ছা হইলে এই রোযা ছাড়িতেও পারে।

১০৪৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া ইহুদীগণকে আশুরার রোযা করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই রোযা কি উদ্দেশ্যে? তাহারা বলিল, এই দিনটি বিশেষ বরকতের দিন, এই দিন আল্লাহ তায়ালা বনী-ইস্রাইলকে তাহাদের শত্রু ফেরাউনের কবল হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করণার্থে এবং সেই মহান নেয়ামত স্মরণার্থে) মুছা আলাইহেচ্ছালাম এই দিন রোযা রাখিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মুছা আলাইহেচ্ছালামের সহযোগিতার জন্য আমরা অধিক আগ্রহশীল। এই বলিয়া নবী (দঃ) (পূর্বের ন্যায়) এই দিনের রোযা রাখিলেন এবং সকলকে রোযা রাখিতে আদেশও করিলেন।

১০৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদিরা আশুরার দিন ঈদের দিনের ন্যায় আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করিত (এবং উহার সম্মানার্থে রোযা রাখিত)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানগণকে আদেশ করিলেন, তোমারও এই দিনের রোযা রাখ।

১০৪৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আশুরার দিনে এবং রমজান মাসের রোযাকে যেরূপ অগ্রাধিকার ও ফজিলত দান করিয়া থাকিতেন, অন্য কোন দিনকে বা অন্য কোন মাসকে এরূপ ফজিলত দান করিতে আমি দেখি নাই।

১০৪৬। **হাদীছ ঃ**—ছালামা-তুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রের এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন নয় ধারণা করিয়া) যাহারা পানাহার করিয়াছে তাহারা দিনের বাকি অংশ রোযার ন্যায় অনাহারে কাটাইবে। যাহারা এখনও পানাহার করে নাই, তাহারা রোযা রাখিবে; অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিনের রোযা এই উম্মতের জন্য নবী (দঃ) ফরজ রূপে আদেশ করিয়াছিলেন; এই তথ্য আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৮২৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছের নির্দেশটি ঐ সময়েরই। আশুরার রোযা ফরজ হওয়া রহিত হইয়া যাওয়ায় এই আদেশও রহিত হইয়া গিয়াছে।

পাঠকবর্গ! আশুরার দিন মোহারম চাঁদের দশ তারিখ, তাই কেহ ধারণা করিতে পারে যে, ইমাম হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনার সঙ্গে আশুরার রোযার কোন সম্পর্ক রহিয়াছে। এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা-প্রসূত। কারণ, ঐ ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বহু পরে ঘটিয়াছে, অথচ এই আশুরার রোযা নবী (দঃ) স্বয়ং রাখিয়াছেন এবং ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই মোসলমানগণকে এই রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, বরং তাঁহারও বহু পূর্বে মুছা আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক এই রোযা রাখাও প্রমাণিত হইয়াছে, বরং ইহারও বহু পূর্বে নুহ (আঃ) ও এই দিনের রোযা রাখিয়াছিলেন। কারণ, মহাতুফান ও প্লাবন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার তরী এই দিনই 'জুদী' পর্বতের উপর দাঁড়াইয়াছিল।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু

● রমযান আরম্ভের চাঁদ এবং রমযান শেষ হওয়ার চাঁদ দেখায় তৎপর হইবে (২৫৫ পৃঃ)। ইসলামের বিশেষ ফরজ—রোযা ইহার উপর নির্ভরশীল।

● রমযান শরীফের রোযা শুধু কেবল গতানুগতিক ভাবে রাখিবে না, বরং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমানের তাগিদে আল্লার আদেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত ছওয়াব লাভের প্রেরণা এবং ফরজ আদায়ের নিয়্যতকে অন্তরে উপস্থিত রাখিয়া প্রতিটি রোযা আরম্ভ করিবে। (২৫৫ পৃঃ)

● নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযান মাসে (রূহানী ও বাহ্যিক উভয় প্রকার দানে) অধিক দানশীল হইতেন (২৫৫ পৃঃ)। অতএব রমযান মাসে বাহ্যিক দান-খয়রাতে এবং আল্লার বন্দাদের মধ্যে দ্বীন বিতরণে অধিক তৎপর হওয়া সুন্নত।

● ঝগড়া প্রতিরোধ এবং গালিগালাজ বারণ করার জন্য এরূপ বলা যে, আমি রোযা আছি—দোষনীয় নহে। (২৫৫)

● পানি বা সহজসাধ্য যে কোন বস্তু দ্বারাই ইফতার করা যায়। (২৬৩ পৃঃ) এমনকি অগ্নিস্পর্শে তৈরী বস্তু দ্বারাও ইফতার করা যায়। (১০০৩ নং হাদীছের ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাতুর সরবৎ দ্বারা ইফতার করিয়াছিলেন।) জব ইত্যাদির ছাতু তৈরী করিতে প্রথমে উহাকে আগুনে ভাজা করিতে হয়। অগ্নিস্পর্শ বিহীন বস্তু শুধু পানি হইলেও উহা দ্বারাই ইফতার করা উত্তম।

● নফল রোযা রাখিতে মেহমানের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দেহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বদা রোযা রাখা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়। নফল রোযার আধিক্যের সর্বশেষ সীমা হইল—একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখা; দাউদ আলাইহেছ্ছালামের নফল রোযার রীতি ইহাই ছিল (২৬৫ পৃঃ)। এই বিষয় কয়টি একই হাদীছে প্রমাণ করা হইয়াছে; হাদীছটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। নফল নামায-রোযা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে নীতি নির্ধারনী পরামর্শও উক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছটির বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ অনুবাদ ১০২৯ নম্বরে হইয়াছে।

তারাবীর নামায

১০৪৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাত্রে উহার বিশেষ নামায (অর্থাৎ তারাবীর নামায—এই অর্থ সমস্ত ইমামগণের সিদ্ধান্ত। বোখারী শরীফের শরাহ আইনী ও মোসলেম শরীফের শরাহ নববী দ্রষ্টব্য।) ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যোহরী (রঃ) উক্ত হাদীছ উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে তারাবীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এবং উহার ফজিলত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে, উহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হইত না। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালেও তারাবীর নামাযের অবস্থা ঐরূপই ছিল। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের প্রথম দিকেও ঐ অবস্থাই ছিল। (কারণ তখন লোকগণ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই অধিক বন্দেগী করিত।)

একদা ওমর (রাঃ) রমযান শরীফের রাত্রে মসজিদে আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন লোকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারাবীর নামায পড়িতেছেন—কেহ কেহ একাকী পড়িতেছেন, কাহারও সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোক জমাআত করিয়া পড়িতেছেন। এতদৃষ্টে ওমর (রাঃ) এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, সকলকে সমবেতভাবে এক ইমামের পেছনে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং ইহা উত্তম হইবে। অতঃপর সেই ইচ্ছাকে তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করিলেন—সকলকে প্রধানতম কারী উবায়ী-ইবনে-কায়াব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সমবেতভাবে নামায পড়ার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর আর একদিন তিনি মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, সকলে সমবেতভাবে এক ইমামের সঙ্গে তারাবীহ পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও ইহা একটি নূতন ব্যবস্থা কিন্তু অতি উত্তম ব্যবস্থা।

অতঃপর তিনি বলিলেন, (যদিও ইহা উত্তম, কিন্তু) রাত্রের প্রথম ভাগের নামায হইতে শেষ ভাগের নামায উত্তম।

(ওমর (রাঃ) রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের সময় তারাবীর নামায পড়াকে অগ্রাধিকার দান করিতেন এবং তিনি নিজে তাহাই করিতেন।) সাধারণতঃ অন্য সকলে তারাবীর নামায রাত্রের প্রথম ভাগে পড়িয়া থাকিতেন।

১০৪৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা রমযানের মধ্যে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন এবং নামায পড়িতে লাগিলেন; কতেক লোক তাঁহার সঙ্গে নামাযে শরীক হইল। ভোর হইলে পর সকলের মধ্যেই এই বিষয় চর্চা হইল, তাই দ্বিতীয় দিন আরও অধিক লোকের সমাবেশ হইল এবং তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িল। ঐ দিন ভোরে আরও অধিক চর্চা হইল এবং তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোক সমবেত হইল; ঐ দিনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে আসিয়া নামায পড়িলেন এবং উপস্থিত সকলেই তাঁহার সহিত একত্রে জমায়াতে নামায পড়িল। চতুর্থ রাত্রিতে লোকের সমাগম এত অধিক হইল যে, মসজিদের মধ্যে সঙ্কুলান সম্ভব হইল না; (কিন্তু ঐ দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন না।) যখন ফজর নামাযের সময় উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) মসজিদে আসিলেন, ফজরের নামাযান্তে সকলকে সম্বোধন করিয়া খোৎবা পাঠে ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন—তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত রহে নাই। কিন্তু আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, (এই বিশেষ নামাযটির

প্রতি এত অধিক আগ্রহ দৃষ্টে) উহা তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। সে অবস্থায় (ফরজ নামাযের প্রতি প্রযোজ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ, যেমন—সর্বদা পাবন্দীর সহিত আদায় করা, সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে কখনও অবহেলার অবকাশ না থাকা; সর্বদা উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা অবলম্বন করা ইত্যাদি এই সুদীর্ঘ নামাযের ক্ষেত্রে বজায় রাখিয়া চলিতে) তোমরা অক্ষম হইয়া পড়িবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজীবন পর্য্যন্ত (রমযানের বিশেষ নামায তারাবীর) অবস্থা এইরূপই রহিল (যে, উহার বাধ্যবাধকতার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই)।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত দুইটি হাদীছের দ্বারা তারাবীর নামাযের ইতিবৃত্ত প্রকাশ পাইল যে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই নামাযের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। উহার অনেক অনেক ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং উহা পড়িয়াছেন, অন্য লোকদিগকে তাঁহার সহিত জমায়াতরূপে শরীফ হওয়া সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা সর্বদা চালাইয়া যান নাই বটে, তাহা বিশেষ কারণাধীন ছিল। কারণটি উপরোল্লিখিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই নামাযের প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রদর্শনে আশঙ্কা আছে উহা ফরজ করিয়া দেওয়ার। সেই কারণ তিনি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, সেই কারণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবন-কাল পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার পরে সেই কারণের আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পর অহী চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়, নূতনভাবে কোন বিষয় ফরজ হওয়ার অবকাশ নাই। ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের প্রথম অংশে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন বড় বড় সমস্যায় পতিত ছিলেন। উহা অতিক্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়া যখন তিনি কতিপয় মছআলাহ ও বিষয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন এই তারাবীর প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া দৃষ্টে তারাবীর জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করিলেন, রাকাত সংখ্যা ২০ সাব্যস্ত করিলেন এবং জমায়াতের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে তারাবীর প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎকালীন সোনালী যুগে বিদ্যমান হাজার হাজার ছাহাবীগণও আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ব্যবস্থা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিলেন। ছাহাবীগণের এজমার দ্বারা এই বিষয়টি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

তারাবীর নামাযের রাকাত-সংখ্যা ঃ

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ প্রমুখগণ এক বাক্যে তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়াছেন। ইমাম মালেক হইতে ২০ এবং ৩৬ উভয় সংখ্যাই বর্ণিত আছে, অনেকে ২০ রাকাতের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য বলিয়াছেন। সেমতে তারাবীর নামায ২০ রাকাত হওয়াকে এজমা বলা হয়। (আওজাযুল-মাছালেক দ্রষ্টব্য)।

কলুষমুক্ত বিবেকে চিন্তা করিয়া বলুন—মদীনার ইমাম মালেক, মক্কার ইমাম শাফী, দশ লক্ষ হাদীছের হাফেজ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহ ইমাম আবু হানীফা—সকলের একই সিদ্ধান্ত যে, তারাবীর নামায ২০ রাকাত হইতে কম নহে—এই সিদ্ধান্ত কিরূপ শক্তিশালী এবং বিশ্ব-বরণ্য ইমামগণের ঐক্যমত পূর্ণ; এইরূপ সিদ্ধান্তের মূল্য কি হইতে পারে তাহা বিবেকের নিকটই জিজ্ঞাসা করুন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদ্দেছ আ'তা (রঃ) যাহার মৃত্যু ৮০ বৎসর বয়সে; নবীজীর মাত্র ১০৫ বৎসর পরে। ছাহাবীগণের যুগের এই মহাদ্দেছ তাঁহার দীর্ঘ ৮০ বৎসরের পূর্ণ জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত বস্তুরূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—আমি সকল লোকদেরকেই দেখিয়াছি, তাঁহারা (জমাতের সহিত) বেতেরের সঙ্গে (তারাবীর নামায) ২০ রাকাতই পড়িতেন (ইবনে-আবী শায়বা)।

এই মহাজন মোহাদ্দেছ দীর্ঘ জীবনে যাহাদিগকে দেখিয়াছেন—তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী বা তাঁহাদেরই শাগির্দান—তাবেয়ী ছিলেন।

সুধী পাঠক! এক শ্রেণীর লোক হাদীছের নাম লইয়া আস্ফালন দেখায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—হাদীছ নিঃসন্দেহে সকলের উর্দ্ধে; সেই জন্য এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ হাদীছের যে অর্থ বুঝিবে এবং সাব্যস্ত করিবে তাহাও কি বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের এবং ছাহাবী ও তাবেয়ী—তথা নবীজি হইতে শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তাঁহার নিকটতম যুগের জ্ঞানীগণের বুঝ ও সাব্যস্তের উর্দ্ধে হইবে? আর যদি তাহারা পূর্ববর্তী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণের দাবী করে তবে বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, বরং তাঁহাদের কুৎসা গাহিয়া এমন লোকদের অনুসরণ করা বোকামী নয় কি যাহারা আমাদের তুলনায় লক্ষ-কোটি গুণ উর্দ্ধের হইলেও ঐ বিশ্ব-বরণীয় ইমাম ও আলেমগণ অপেক্ষা হাজার গুণ নিম্নে?

এতদ্ভিন্ন পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেমগণের অধিকাংশই তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়া গিয়াছেন। এই সত্য শুধু আমাদের কথা নহে, ছেহাহ্-ছেত্তা তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয় কেতাবের এক কেতাব তিরমিযী শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وقال الشافعى وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

ইমাম তিরমিযী (রঃ) তারাবীর রাকাত-সংখ্যায় মতভেদ ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন—"আলী (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যান্য ছাহাবীগণ হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ আলেমগণ ২০ রাকাতের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। ছুফিয়ানে ছৌরী, ইবনুল মোবারক এবং ইমাম শাফীর সিদ্ধান্তও

ইহাই। ইমাম শাফী আরও বলিয়াছেন যে, আমি আমাদের দেশ মক্কা এলাকায় ইহাই পাইয়াছি যে, লোকগণ তারাবীর নামায ২০ রাকাতই পড়েন।

এতদ্ভিন্ন তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে হাদীছের প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, হাদীছের বিধান-শাস্ত্রের ধারা আছে যে, সীমা বা সংখ্যা নির্ণয়ে কোন ছাহাবীর কার্য্যে বা কথায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নাম উল্লেখ না থাকিলেও উহাকে নবী করীমের শিক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে সাতটি হাদীছ প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। একটি হাদীছ স্পষ্টতঃ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল ও ক্রিয়ারূপে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং বেতের পড়িতেন।

আর তিনটি হাদীছ খলীফা ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তারাবীর সুব্যবস্থা করার সাথে উহা ২০ রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একটি হাদীছ আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে কোরআন বিশেষজ্ঞগণকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্দ্ধারিত করিলেন ২০ রাকাত তারাবী পড়াইবার জন্য।

একটি হাদীছ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং তিন রাকাত বেতের পড়িতেন।

একটি হাদীছ উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মদীনা শরীফে রমযান মাসে ২০ রাকাত নামায পড়ার ইমামতী করিতেন।

এই সমস্ত হাদীছ অনেক অনেক হাদীছের কেতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই হাদীছ সমূহ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীগণও স্বীকার করে যে, ইহার কোনটিই জাল বা মিথ্যা নহে। অবশ্য তাহারা হইতে দুই রকম দোষ বাহির করিয়া থাকে। কোনটি সম্পর্কে ত শুধু এতটুকু দোষ যে, উহার ছনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে। অর্থাৎ পরম্পরা রাবী বা বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এরূপ আছে যে, এক রাবী অপর রাবী হইতে সরাসরি শোনেন নাই—কোন মাধ্যমে শুনিয়াছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ, ঐ রাবীদ্বয় উভয়ে পূর্ণ বিশ্বস্ত হইলে হাদীছ-পরীক্ষা শাস্ত্রের বিধান মতে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় বটে। এবং আলোচ্য হাদীছ সমূহের ঐ অবস্থা ক্ষেত্রে উভয় রাবী পূর্ণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার দোষ এই বাহির করে যে, কোন কোন হাদীছের ছনদে কোন রাবী বা বর্ণনাকারী দুর্বল আছে।

এই সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ—হাদীছ পরীক্ষা-শাস্ত্রের বিধান রহিয়াছে যে, দুর্বল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও এক মর্মে বর্ণিত হইলে তাহা গ্রহণীয় হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সাতটি হাদীছ একত্রিত—একই মর্মে তথা তারাবী ২০ রাকাত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে; ইহা অবশ্যই গৃহীত হইবে।

উক্ত সত্যকে এড়াইবার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের নিকট ৮ রাকাত তারাবীর পক্ষে দোষ-ত্রুটি বিহীন একটি হাদীছ রহিয়াছে। হাদীছখানা বোখারী শরীফেই আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে—প্রথম খণ্ডে ৬০৮ নম্বরে অনুদিত। উক্ত হাদীছকে ৮ রাকাতওয়ালারা জঘন্য রকমের কারচুপির সহিত ছাটকাট করিয়া এইরূপে প্রকাশ করে যে, আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—নবী (দঃ) রমযানের রাত্রে কিরূপ নামায পড়িতেন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না।" বিরুদ্ধবাদীরা বুঝাইতে চাহে যে, এই এগার রাকাতে বেতের তিন রাকাত আর তারাবী আট রাকাত।

বিরুদ্ধবাদীদের ভয় করা উচিৎ; উক্ত হাদীছে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উত্তরটা পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হইলে তাহাদের ধাঁধা ও কারচুপি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং ধামাচাপার আবরণ খুলিয়া যাইবে। পূর্ণ উত্তর ছিল এই—

ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة

"আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, নবী (দঃ) রমযানে এবং গায়রে-রমযানে তথা রমযান ছাড়া অন্য সময়েও এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না।"

লক্ষ্য করুন! আয়েশা (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে গায়রে-রমযান—রমযান ছাড়া অন্য সময়ের রাত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনিবার্য্যতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য এমন নামায সম্পর্কে এগার রাকাত বলা যাহা রমযান এবং রমযান ছাড়া অন্য সময়ও পড়া হইয়া থাকে। তারাবী কি রমযান ছাড়া অন্য সময় পড়া হয়? সুতরাং এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারেই না। ইহার উদ্দেশ্য রাত্রের ঐ নামায যাহা রমযান ছাড়াও পড়া হয়—তাহা হইল তাহাজ্জুদ-নামায। আয়েশা (রাঃ)কে রাত্রের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ তাহাজ্জুদকেই রাত্রের নামায বলা হয়, তাই আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিয়াছেন, নবী (দঃ) তাহাজ্জুদ-নামায রমযানে ও গায়রে-রমযানে একই রকম—বেতের সহ এগার রাকাত পড়িতেন। তাহাজ্জুদ-নামাযের পরিমাণ তিনি রমযানে বেশী করিতেন না। আলোচ্য হাদীছের এই তাৎপর্য্যই ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে ১৫৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন—"রমযানে ও গায়রে-রমযানে নবীজির তাহাজ্জুদ" উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি এই হাদীছখানাই উল্লেখ করিয়াছেন।

খাছ তাহাজ্জুদ ভিন্ন রমযানের রাত্রে সর্বমোট নামায এগার রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া—ইহা ত আয়েশা (রাঃ) বলিতেই পারেন না। কারণ, স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) রমযান মাসে নবীজির অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন--'রমযান আসিলেই আল্লার দরবারে দোয়া ও কান্নাকাটায় নবীজির চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার নামাযের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়া যাইত (বায়হাকী)।

আর তাহাজ্জুদ ও তারাবী উভয় নামাযকে যে, বিরুদ্ধবাদীরা একই নামায বলে ইহা ত নিতান্তই অবান্তর। বোখারী (রাঃ)ও নামায-অধ্যায়ে তাহাজ্জুদের বয়ান রাখিয়াছেন; আর তারাবীর জন্য রোযা-অধ্যায়ে ভিন্ন বয়ান রাখিয়াছেন। এমনকি মিশরীয় ছাপার বোখারী শরীফে তারাবী-নামাযের শিরোনামা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকারে রহিয়াছে। বলা হইয়াছে, "তারাবীর নামাযের অধ্যায়"। তারাবীর নামাযকে পরিচ্ছেদ আকারে বর্ণনা করা হয় নাই।

এই সুদীর্ঘ আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য হাদীছখানা ছহীহ বটে, কিন্তু তারাবীর নামাযের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্কও ইহার নাই।

আট রাকাতওয়ালাগণ অন্য দুইটি হাদীছও পেশ করিয়া থাকে। একটি ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যে, তিনি বেতের সহ এগার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ! স্মরণ রাখিবেন--তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ওমর (রাঃ) হইতে তিন জনের বর্ণনা হাদীছের কেতাবে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন ২০ রাকাত বলিয়াছেন; আর একজন দুই রকম বলিয়াছেন—২০ রাকাত এবং ৮ রাকাত।

এমতাবস্থায় এই বর্ণনাকারীর ৮ রাকাত বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় কি?

আর একখানা হাদীছ নবী (দঃ) সম্পর্কে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ হাদীছ খানার ছনদ দোষী এবং নিতান্তই দুর্বল—ইহা যথাস্থানে প্রমাণিত আছে। অথচ ইহার সমর্থনে আর কোন হাদীছ নাই; অতএব এই দুর্বল ছনদের হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ২০ রাকাত সম্পর্কে সাত খানা হাদীছ রহিয়াছে।

লাইলাতুল-ক্বদরের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে একটি বিশেষ ছুরা নাযেল করিয়াছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ

مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم. مِّن كُلِّ أَمْرٍ.

سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

অর্থ—তোমরা জানিয়া রাখিও, আমি এই পবিত্র কোরআনকে ক্বদরের রাত্রে নাযেল করিয়াছি ; লাইলাতুল-ক্বদর কিরূপ ফজিলতের রাত্র তাহা জান কি? লাইলাতুল-ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম। সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং জিব্রাইল (আঃ) আল্লার আদেশানুক্রমে (দুনিয়ার বুকে) অবতরণ করিয়া থাকেন—সমস্ত মানবের মঙ্গল ও কল্যাণ লইয়া। সেই রাত্রটি প্রভাত পর্য্যন্ত শান্তিই শান্তি।

লাইলাতুল-ক্বদরের সম্ভাব্য সময়

১০৪৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছাহাবী স্বপ্নে লাইলাতুল-ক্বদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের স্বপ্ন (বিভিন্ন রকম হইলেও) এই বিষয়ে এক দেখিতেছি যে, লাইলাতুল-ক্বদর রমযানের শেষ সাত দিনে অবস্থিত। সেমতে উহার অভিলাষী ব্যক্তি যেন উহাকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে পাইবার চেষ্টা করে।

১০৫০। হাদীছ ঃ— عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ○

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্র সমূহে তালাশ কর।

১০৫১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা লাইলাতুল-ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

১০৫২। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقٰى

فِى سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِى خَامِسَةٍ تَبْقٰى ○

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর—একুশ তারিখে, তেইশ তারিখে এবং পঁচিশ তারিখে।

ব্যাখ্যা ঃ—লাইলাতুল-ক্বদরকে তালাশ করার অর্থ উহার সম্ভাব্য তারিখ সমূহে বিশেষরূপে এবাদত-বন্দেগীর প্রতি তৎপর হওয়া এবং যথাসাধ্য এবাদত-বন্দেগী করতঃ রাত্রি যাপন

করা। উহার বিশেষ সম্ভাব্য সময় রমযান মাসের কুড়ি তারিখের পর হইতে মাসের শেষ পর্য্যন্ত; তন্মধ্যে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখগুলি অন্যতম। বিভিন্ন হাদীছ সূত্রে এতদূরই প্রমাণিত হয়। লাইলাতুল-কদরের উদ্দেশ্যেই রমযানের শেষ দিনগুলির এ'তেকাফ করা হইয়া থাকে।

রমযানের শেষ দশ দিনে এবাদতে বিশেষ তৎপরতা

১০৫৩। হাদীছ:— عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهٗ وَاَحْيَا لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ ○

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রমযানের শেষ দশ দিন আরম্ভ হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অধিক এবাদত-বন্দেগীর জন্য তৎপরতা অবলম্বন করিতেন এবং এবাদত বন্দেগীতে রাত্র যাপন করিতেন, পরিবারবর্গকেও তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ (করতঃ এবাদত-বন্দেগীর প্রতি ধাবিত) করিতেন।

এ'তেকাফের বয়ান

১০৫৪। হাদীছ:—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন।

১০৫৫। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় জীবনে প্রতি বৎসর রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণও ঐরূপ এ'তেকাফ করিয়াছেন।

এ'তেকাফ অবস্থায় বাড়ী আসিবে না

১০৫৬। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে এ'তেকাফরত অবস্থায় স্বীয় মাথা আমার প্রতি ঝুকাইয়া দিতেন; আমি তাঁহার মাথা আচড়াইয়া দিতাম, অথচ আমি তখন ঋতু অবস্থায় থাকিতাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) (মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি) মানবীয় আবশ্যক ব্যতীত এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাড়ী আসিতেন না।

রাত্রে এ'তেকাফের মান্নত মানিলে?

১০৫৭। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে

এই মান্নত করিয়াছিলাম যে, আমি হরম শরীফের মসজিদে (একদিন) এক রাত্র এ'তেকাফ করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাঁহার মান্নত পূর্ণ করার পরামর্শ দিলেন।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে শুধু এক রাত্রি এ'তেকাফ করার মান্নত করিলে সেই মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য নফলরূপে তাহা করিয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু একাধিক রাত্রের সংখ্যা উল্লেখ করিয়া—যেমন দুই, তিন বা চার রাত্রের এতেকাফ করার মান্নত করিলে উক্ত রাত্র সমূহ উহার দিন সহ এবং রোযার সঙ্গে এ'তেকাফ করা ওয়াজেব হইবে; রাত্র আগে দিন পরে হিসাব ধরিতে হইবে (ফতওয়া কাজিখান)। অবশ্য যদি মান্নতে স্পষ্টরূপে নিয়্যত থাকে যে, দিন নয়—শুধু রাত্রেই এ'তেকাফ করিব তবে সেই মান্নত ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি এক বা ততোধিক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে এবং স্পষ্টরূপে নিয়্যত করে যে, শুধু দিনেই এ'তেকাফ করিব রাত্রে নয়, তবে সেক্ষেত্রে মান্নত ওয়াজেব হইবে এবং রোযার সহিত শুধু দিনে এ'তেকাফ করিতে হইবে। ঐরূপ স্পষ্ট নিয়্যত না করিলে দিনের সহিত ঐ সংখ্যক রাত্রেরও এ'তেকাফ করিতে হইবে এবং রাত্র দিনের পূর্বে ধরিতে হইবে। (ফতওয়া আলমগিরী)

এ'তেকাফ করিতে মসজিদে জায়গা ঘেরাও করা

১০৫৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং আমি তাঁহার জন্য মসজিদে তাবুর ন্যায় করিয়া একটু স্থানকে ঘেরাও করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাম। তিনি ফজর নামাযান্তে সেই ঘেরাও -এর ভিতর প্রবেশ করিতেন (এবং তথায় এবাদত বন্দেগী করিতেন।) একবার আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং নিজেও এ'তেকাফ করার জন্য ঐরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি চাহিলেন; নবী (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর হাফছা রাজিয়াল্লাহু আনহাও ঐরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি চাহিলেন, আয়েশা (রাঃ) তাহার জন্য অনুমতি আনিয়া দিলেন, তিনিও তৃতীয় আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন। জয়নাব (রাঃ) উহা দেখিতে পাইয়া তিনি চতুর্থ আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন। ভোরবেলা নবী (দঃ) মসজিদের মধ্যে চারটি ঘেরাও দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কি? তখন পূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে অবগত করান হইল। হযরত (দঃ) (ঘেরাও সমূহের দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ হইয়া নামাযীদের অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কা পূর্বক স্বীয় ঘেরাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং) বলিলেন—(মসজিদে নামাযীদের অসুবিধা করিয়া) তাহারা নেকী হাসিল করিতে চায়? এই বলিয়া এ'তেকাফ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি পরবর্তী শাওয়াল মাসে পুনঃ দশ দিনের এ'তেকাফ করিলেন।

এ'তেকাফরত স্বামীর সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ

১০৫৯। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মসজিদে উপস্থিত হইলেন ; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন রমজানের শেষ দশ দিনে মসজিদের মধ্যে এ'তেকাফরত ছিলেন। উভয়ে কিছু সময় কথাবার্তা বলার পর ছফিয়া (রাঃ) ঘরে ফিরার জন্য দাঁড়াইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও দাঁড়াইলেন এবং ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে মসজিদের দরওয়াযা পর্যন্ত আসিলেন। তথায় নিকটস্থ পথে দুইজন মদীনাবাসী ছাহাবী কোথাও যাইতেছিলেন ; তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সালাম করিলেন (এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকা অবস্থায় তাঁহারা সম্মুখে পড়িয়া যাওয়ায় লজ্জাবোধে দূরে সরিয়া পড়ার জন্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইও না (দাঁড়াও এবং এখানে আস)। আমার সঙ্গস্থ মহিলাটি আমারই স্ত্রী—ছফিয়া। (ছাহাবীদ্বয় অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একজন নারীর সঙ্গে দেখিয়া শয়তানের ধোকায় ও কারসাজিতে কোন কুধারণার বশীভূত হইয়া স্বীয় দীন-ঈমান বরবাদ করিয়া বসি না-কি—এই আশঙ্কায় রসুলুল্লাহ (দঃ) এই উক্তি করিয়াছেন। তাই) তাঁহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ ·· ইয়া রসুলাল্লাহ ! (আমরা আপনার প্রতি কোন কুধারণার বশীভূত হইতে পারি কি ?) রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাহাদের জন্য পাহাড়তুল্য মনে হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, উপস্থিত তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে সেই ধারণা নয়, কিন্তু জানিয়া রাখিও, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলিতে সক্ষম। (তাই আশঙ্কা আছে যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে না-কি—উহারই পথ বন্ধ করিয়া দিলাম।)

রমযানের কুড়ি দিন এ'তেকাফ করা

১০৬০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) সাধারণতঃ প্রতি রমযানে দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। কিন্তু যেই বৎসর তিনি ইহকাল ত্যাগ করিবেন, সেই বৎসর তিনি কুড়ি দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

- ঋতুবতী স্ত্রী এ'তেকাফরত স্বামীর যেদমতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে।
- এ'তেকাফ অবস্থায় শরীর বা অঙ্গ ধৌত করা যায় (২৭২ পৃঃ)। কিন্তু উহার জন্য কিম্বা সাধারণ গোসল করার জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ফরজ গোসলের

জন্য বাহির হইতে হইবেই। সাধারণ গোসলের প্রয়োজন হইলে পেশাব-পায়খানার জন্য বাহির হওয়ার সুযোগে সেই পথেই অল্প সময়ে গোসল করিতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও গোসলের জন্য অন্যত্র যাওয়া কিম্বা শরীর মর্দনে বা কাপড় ধোয়ায় বিলম্ব করা জায়েয নহে।

● নারীদের জন্য এ'তেকাফ করা জায়েয (হাদীছ ১০৫৮ দ্রষ্টব্য)। উক্ত হাদীছে হযরতের বিবিগণের মসজিদে এ'তেকাফ করার উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ড ২২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে নামাযের জন্যও নারীদের মসজিদে উপস্থিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ'তেকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান ত আরও গুরুতর। সেমতে নারীদের এ'তেকাফের ব্যবস্থা হইল—গৃহাভ্যন্তরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিলে সে স্থানে; আর ঐরূপ নামাযের নির্দিষ্ট স্থান না থাকিলে গৃহাভ্যন্তরে কোন একটি স্থানকে এ'তেকাফের জন্য সাময়িকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া লইবে (হেদায়াহ, ফতহুল-কাদীর)। তথায় মসজিদে অবস্থানের ন্যায়ই অবস্থান করতঃ এ'তেকাফ উদযাপন করিবে; পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়া একাগ্রতার সহিত এবাদত বন্দেগীরত থাকিবে।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি তাহার সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জনে কথাবার্তা বলিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ এ'তেকাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলায় দোষ নাই।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি কোন কাজের প্রয়োজনে (মসজিদ হইতে বাহির হইয়া নয়,) মসজিদের দরওয়াজা পর্যান্ত আসিতে পারে। (২৭২ পৃঃ)

● এসতেহাজাগ্রস্তা মহিলাও এ'তেকাফ করিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—যে অবস্থাকে শরীয়তে ওজরগণ্য করা হইয়াছে, যেমন কাহারও প্রস্রাব ঝরার ব্যধি আছে সে মসজিদে এ'তেকাফ করিতে পারে। অবশ্য মসজিদকে কোন রকম অপবিত্র করা হইতে অবশ্যই পূর্ণ সতর্ক থাকিতে হইবে এবং উহার জন্য সুব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

● এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রি মসজিদে যাপন করিয়া ভোর বেলায় মসজিদ হইতে বাহির হওয়া (২৭৩ পৃঃ)। এস্থানে একটি সুন্দর বিষয় অনুধাবন যোগ্য—সাধারণতঃ এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রিটি ঈদের রাত্রি। ঈদের রাত্রকে এবাদৎ বন্দেগীতে যাপন করার বিশেষ ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে! সুতরাং যদি এ'তেকাফ সমাপ্ত করিয়া ঐ রাত্রিটিও ঐ সঙ্গে মসজিদেই উদযাপন করিয়া আসে তবে সেই বিশেষ ফজিলতও হাসিল হয়।

● শাওয়াল মাসে তথা রমযান ছাড়া অন্য মাসেও এ'তেকাফ করা যায় (২৭৩ পৃঃ)। বিশেষতঃ রমযানে এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া কোন কারণে উহা ত্যাগ করিলে একদিনের এ'তেকাফ ওয়াজেবরূপে এবং অতিরিক্ত মোস্তাহাবরূপে কাজা করিতে হয়; সেই কাজা এ'তেকাফ রমযান ছাড়া অন্য মাসে করা যায়।

● রোযাবিহীনও (নফল) এ'তেকাফ করা যায় (২৭৪ পৃঃ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এ'তেকাফ তিন প্রকার---ওয়াজেব, সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ, নফল। মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজেব—যাহা এক দিনের কম হয় না। রমযানের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফ সাধারণ ভাবে রাখা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ কেফায়াহ্। মান্নত এবং এই দশদিন ছাড়া অন্য সময়ের এ'তেকাফ নফল।

হানফী মজহাব মতে ওয়াজেব এবং সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত; রোযা ব্যতিরেকে উহা আদায় হইবে না, এমনকি মান্নতের সময় যদি উল্লেখও করে যে, রোযাবিহীন দুই দিনের এ'তেকাফ করিব তবুও ঐ এ'তেকাফ রোযার সহিত করিতে হইবে। নফল এ'তেকাফ যাহা অল্প সময়ের জন্যও হইতে পারে উহা রোযা ছাড়াই শুদ্ধ হইবে।

● অমোসলেম থাকাবস্থায় এ'তেকাফের মান্নত থাকিলে মোসলমান হইয়া উহা আদায় করা উত্তম (২৭৩ পৃঃ)। অন্যান্য নেক আমলের মছআলাহও এইরূপই।

● এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া উহা ভঙ্গ করিলে কি করিতে হইবে?

মছআলাহ :—যদি এ'তেকাফ মান্নতকৃত ছিল এবং মান্নত ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের—যেমন, পনর দিনের কিম্বা অনির্দিষ্ট এক মাসের সে ক্ষেত্রে উক্ত সংখ্যক দিনের বা যে কোন এক চন্দ্র মাসের এ'তেকাফ রোযার সহিত একটানা ভাবে রাখিতে হইবে। উহা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এমনকি সর্বশেষ দিনও যদি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় তবে পুনরায় প্রথম হইতে উক্ত সংখ্যক বা এক মাসের এ'তেকাফ আদায় করিতে হইবে। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট মাস যেমন মহরম মাসের এ'তেকাফ মান্নত করিয়াছিল; সে ক্ষেত্রেও ঐ এক মাস একটানাভাবে এ'তেকাফ করা ওয়াজেব; কিন্তু যদি উহার কোন দিন এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় তবে শুধু ভঙ্গকৃত দিনের এ'তেকাফ কাজা করিলেই চলিবে (ফতহুল-কাদীর)। যদি সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ তথা রমযানের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া এ'তেকাফে বসে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ করে তবে ঈদের পর পুনরায় দশ দিনের এ'তেকাফ করা উত্তম। অন্ততঃ একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব।

তদ্রূপ যদি নফল রূপেও নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের অথবা এক দিনেরই এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া এ'তেকাফ আরম্ভ করার পর উহা পূর্ণ করার পূর্বে এ'তেকাফ ভঙ্গ করে সে ক্ষেত্রেও একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব হইবে (ফতওয়া-কাজিখান)। অবশ্য যদি পূর্ণ দিনের নয়, বরং কম সময়ের এ'তেকাফের নিয়্যত করিয়া থাকে সে ক্ষেত্রে কোন কাজা করিতে হইবে না।

● এ'তেকাফরত ব্যক্তি মসজিদে থাকিয়া স্বীয় মাথা নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ স্বীয় অবস্থান মসজিদে অক্ষুন্ন রাখিয়া শুধু কেবল কোন অঙ্গ মসজিদের বাহির করা, এমনকি স্বীয় গৃহ মসজিদ সংলগ্ন থাকিলে কোন অঙ্গকে সেই গৃহে প্রবেশ করিলে দোষ হইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্য

ভূমিকা—

ইউরোপবাসী বা হিন্দু পণ্ডিতগণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তাহা আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ আমাদের ধর্মের বেলায় কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাহারা ধর্ম শব্দ ব্যবহার করে অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে। তাহারা বলে, মানুষ আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে এবং আল্লাহকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু সময় তাঁহার ধ্যান করিবে বা তাঁহার নাম জপিবে, গুন-কীর্তন করিবে বা তাঁহার নামে কোন ভোগ দিবে বা কোন অনুষ্ঠান করিবে—ধর্ম বলিতে শুধু এইটুকুই বুঝায় এবং ধর্মীয় প্রয়োজন ও প্রক্রিয়া এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের নিকট হইতে ধর্ম আর কিছু চায় না এবং ধর্ম মানুষকে অন্য আর কিছুর জন্য বাধ্যও করে না। কিন্তু আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করি ব্যাপক অর্থে। আমাদের অকাট্য বিশ্বাস ও আকিদা এই যে, মানুষের জীবনে যতগুলি পর্য্যায়, যতগুলি স্তর আছে—সর্ব পর্য্যায়ে, সর্বস্তরে আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ আল্লার আনুগত্যের ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা এই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হইল ধর্মের তাৎপর্য্য।

ধর্মের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা মানবের নিমিত্ত স্বীয় মনোনীত ধর্মকে 'ইসলাম' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ—گردن نهادن بطاعت "সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করা।" মানব তাহার জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লার দাসত্ব এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে অর্থাৎ আল্লার বাণী কোরআন ও আল্লার রসুল বা প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত আইন-কানুন ও আদর্শ তথা শরীয়ত অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে সীমাবদ্ধাকারে পরিচালিত করিবে ইহাই হইল ইসলাম ধর্মের মূল বস্তু ও তাৎপর্য্য। তাই ইসলাম ও শরীয়তের প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই বিস্তার লাভ করিবে।

যাহারা ইসলামকে শুধু মাত্র এবাদৎ-বন্দেগী ও উপাসনার নিয়ম-কানুন সম্বলিত মনে করিয়া থাকে বস্তুতঃ তাহারা ইসলামের শব্দার্থটুকুও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা উহার আভিধানিক অর্থের আওতাভুক্তি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছে।

মানুষ ইতর প্রাণী নহে। মানুষ একদিকে তাহার স্রষ্টার অতি আদরের প্রতিনিধি বা খলীফা—ফেরেশতার চেয়েও অধিক উর্দ্ধে তাহার আসন। আর অন্য দিকে সে সামাজিক জীব। সেই হেতু তাহার বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের প্রয়োজন আছে। সে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী। মানুষের জীবন ছয়টি স্তরে বিভক্ত।

ছয় স্তরে বিভক্ত জীবন-বিশিষ্ট মানবের ইহ-পরকালীন কল্যাণবাহক পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থারূপে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা 'ইসলাম ধর্মকে' মনোনীত করিয়াছেন, ইহা মানুষের মনগড়া ইযম বা মতবাদ নহে। সুতরাং 'ইসলামের' তফসিল ও অনুশাসন ছয় ভাগে বিভক্ত। বলা বাহুল্য—ইসলাম তথা আল্লাহতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ বিকাশের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান নির্ধারিত করিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় 'শরীয়ত'। 'শরীয়ত' শব্দের অর্থও রাজপথ। অতএব শরীয়তও ইসলামের ন্যায় ছয় ভাগে বিভক্ত।

(১) প্রথম বিভাগ—আকিদা, মতবাদ ও বিশ্বাস শ্রেণীর—যে সব বিশ্বাস ও শপথের উপর মানব স্বীয় কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবে। মানব কোন সাধারণ ইতর-প্রাণী নিকৃষ্ট জীব নহে। মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব; স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য কাহারও অধীনতা বা দাসত্ব সে স্বীকার করিয়া নিতে পারে না। সারা বিশ্ব তাহার অধীন; সে শুধু এক বিশ্বপতির অধীন; অন্য কাহারও অধীন সে নহে। মানবের দেহ নশ্বর ও মরণশীল বটে, কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর, অমর, চিরস্থায়ী।

ইসলামের মূল এই যে, হে মানব! তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, বিধানকর্তা আছেন। তাঁহার অধীনে তাঁহার বিধানে তুমি স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ খেলাফত পাইয়াছ। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের বিধান সমূহ তিনি পবিত্র কোরআনের ভিতর দিয়া এবং উহা ছাড়া আরও অসংখ্য অহীর মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মারফত তোমাকে দান করিয়াছেন। যদি তুমি খেলাফতের দায়িত্ব পালন না কর আল্লার নির্ধারিত সীমা-রেখা লঙ্ঘন কর, তবে তুমি পাপী হইবে। আর যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া খেলাফতের হক পালন কর তবে তোমার পুণ্য বা ছওয়াব হইবে। পাপ পুণ্য বিচারের জায়গা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নহে। উহার একটা পৃথক জগৎ নির্ধারিত আছে। উহার নাম আখেরাত বা পরকাল। পরকালে পাপের শাস্তির জন্য দোযখ এবং পুণ্যের পুরস্কারের জন্য বেহেশত নির্ধারিত আছে। মোটামুটি এই বিশ্বাস কয়টি ভিত্তি করিয়া মানুষের জীবন গঠিত ও পরিচালিত হইলে দুনিয়াতে শান্তি আসিতে পারে। কাজেই মানুষের সর্বাগ্রে এই কয়টি সত্য বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন পূর্বক এইগুলির উপর শপথ করিয়া তাহার জীবন যাত্রা শুরু করিতে হইবে। এইসব মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও মৌখিক শপথ গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহ ঈমানের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বিভাগ- এবাদৎ বন্দেগী বা রুহানিয়ত ও আধ্যাত্মিক শ্রেণীর। মানুষ যেহেতু আবিলতাপূর্ণ দুনিয়াতে বাস করে, তাই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলিয়া যায়, তাহার আত্মা ময়লাযুক্ত হইয়া পড়ে। মানব যাহাতে স্বষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া না যায়, তাহার আত্মা যাহাতে ময়লাযুক্ত হইয়া না পড়ে সেই জন্য এবং তাহার রূহানিয়তকে নির্মল ও উন্নত করার ও রাখার জন্য দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার স্বীয় স্বষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে স্মরণ এবং তাঁহার সমীপে আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে। সংযম অভ্যাসের নিমিত্ত অন্ততঃ এক মাস দিবাভাগে রোযা রাখিতে হইবে। যাহা কিছু অর্থ উপার্জন করিবে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ স্বষ্টিকর্তার নামে দীন-দুঃখী স্বষ্টজীবকে দান করিতে হইবে। তাঁহার নাম ও বিধানকে দুনিয়াতে চালু রাখার ও প্রাধান্য দান করার জন্য আজীবন জীবনপণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার গ্রন্থ এবং তাঁহার রসুলের জীবনের আদর্শগুলি সর্বদা গভীরভাবে অধ্যয়ন (study) ও প্রচার করিতে হইবে। এইসব কার্য্যক্রমগুলিই এবাদৎ বন্দেগী বা রূহানিয়ত নামে অভিহিত। নামায, যাকাৎ, হজ্জ ও রোযার অধ্যায় সমূহে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং জেহাদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

(৩) তৃতীয় বিভাগ—এক্‌তেছাদিয়াত তথা অর্থ-ব্যবস্থা—বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, শ্রম ইত্যাদি কিভাবে পরিচালিত করিবে? সে সম্বন্ধে স্বষ্টিকর্তার প্রদত্ত সীমা নির্দ্ধারণকারী বিধান অনুসারে চলিতে হইবে, নিজের খাহেশ মতে চলা যাইবে না।

(৪) চতুর্থ বিভাগ—আখ্‌লাকিয়াত তথা আচার-ব্যবহার বা স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ স্বষ্টিকর্তার সঙ্গে এবং স্বষ্টজীবের সঙ্গে আচার ব্যবহারের বেলায় সদাচারী মিতাচারী হইতে হইবে।

(৫) পঞ্চম বিভাগ—মোয়াশারাত বা সমাজ-ব্যবস্থা; পরিবারবর্গকে কিরূপে গঠন ও উন্নত করিতে হইবে? পরিবার নিয়া কিরূপে চলিতে হইবে? সমাজে ছোট-বড়, গরীব-ধনী, আপন-পর, নর-নারী পথিক-বিপদগ্রস্ত এদের কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে স্বয়ং স্বষ্টিকর্তা যে ব্যবস্থা দিয়াছেন উহার তুলনায় অধিক ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না।

(৬) ষষ্ঠ বিভাগ—ছিয়াছিয়াত তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; শাসন কিভাবে করিতে হইবে? বিচার পদ্ধতি কি হইবে? শাসনকর্তা এবং শাসিতদের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে? শাসনকর্তা নিয়োগের ধারা কি হইবে? আদর্শ কি হইবে? ইত্যাদি সম্পর্কে স্বয়ং স্বষ্টিকর্তার যে বিধান আছে উহার তুলনায় উত্তম বিধান আর নাই।

তৃতীয় বিভাগীয় বিষয় সমূহই আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। অবশিষ্ট বিষয়সমূহ মূল কিতাবের পরবর্তী খণ্ডসমূহে বর্ণিত হইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনের সমুদয় বিভাগের ন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহেরও নীতি-নির্দ্ধারক এবং তৎসম্পর্কে বৈধ-অবৈধের সীমা প্রতিষ্ঠাতা হইলেন একমাত্র সর্বাধিকারী বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালা—অর্থাৎ তাঁহার বাণী কোরআন শরীফ তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথা শরীয়ত।

১। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—احل الله البيع وحرم الربو "আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা বাণিজ্যকে হালাল ও বিধেয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন ও বিধান-সম্মত ঘোষনা করিয়াছেন এবং সুদ প্রথাকে হারাম ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন বিরোধী ও বিধান বহির্ভূত ঘোষণা করিয়াছেন।"

এই আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ক্রয়-বিক্রয় প্রথা হালাল—জায়েয বা শরীয়ত অনুমোদিত, আর সুদ হারাম এবং বিধি বহির্ভূত। সুদ লভ্যাংশযুক্ত আদান-প্রদান হওয়ায় উহা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় মনে হয়, তবুও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা উহাকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

সুদ এবং ক্রয়-বিক্রয় বস্তুদ্বয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাহারও নিকট এক পর্য্যায়ের মনে হইলেও আল্লাহ কর্তৃক হারাম ও হালাল ঘোষিত হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। ইসলামের প্রতিক্রিয়া ও মোসলমান ব্যক্তির কার্য্য হইবে সেই ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে হারাম ঘোষিত সুদকে বর্জনীয় এবং হালাল ঘোষিত ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণীয় মনে করা এবং সেই অনুসারে আমল করা। আল্লার বান্দা হইয়া যদি কেহ ঐ বিরাট ব্যবধানকে ব্যবধান মনে না করে তবে সে বস্তুতঃ জ্ঞানশূন্য পাগল বিবেচিত হইবে এবং তাহার বিবেক-বুদ্ধির উপর নফছ ও শয়তানের ভূত ছওয়ার হইয়াছে বলিতে হইবে।

আজ তাহারা নিজকে যুক্তিবিদ জ্ঞানী মনে করিলেও আখেরাতে তাহাদের পাগলাকৃতি ও ভূতাক্রান্ত প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.

অর্থ—যাহারা সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা (কবর হইতে) ঐ উন্মাদ পাগলের ন্যায় উঠিবে যাহাকে জ্বিন-ভূতের আছরে উন্মাদ করিয়া দিয়াছে। কারণ, তাহারা এরূপ

বলিয়া থাকিত যে, ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ একই পর্য্যায়ের। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তেজারতকে আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন হালাল এবং সুদকে করিয়াছেন হারাম। (৩ পারা ৬ রুকু)

হালাল-হারামের বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কাফেররা স্বার্থান্ধ হইয়া সাধারণ মানুষের চোখে ধুলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিত, ব্যবসায়ের মধ্যেও যেমন পাঁচ মণ ধান ৫০'০০ টাকায় ক্রয় করিয়া ৬০'০০ টাকায় বিক্রি করিলে ১০'০০ টাকা লাভ হয়; তদ্রূপ ৫০'০০ টাকা নগদ একজনকে ধার দিয়া তাহার উপকার করিয়া তাহার নিকট হইতে ৫৫'০০ টাকা গ্রহণ করিলে ৫'০০ টাকা লাভ হয়; এমতাবস্থায় ইহা কতই না বেখাপ্পা কথা যে, ৫০'০০ টাকায় ১০'০০ টাকা লাভ করা ত জায়েয ও হালাল, অথচ ৫০'০০ টাকায় ৫'০০ টাকা লাভ করা হারাম, নিষিদ্ধ ও অপবিত্র আর আইন বিরোধী। যেমন একজন বলে, একটা বাঘেরও চারখানা পা একটা গরুরও চারখানা পা, বরং গরুর আরও দুইখানা শিং আছে এতদসত্ত্বে কেন বলা হয় যে, খবরদার—বাঘের কাছে যাইও না, বাঘের গোশত খাইও না, উহা হারাম ও অখাদ্য, কিন্তু গরুর কাছে যাইতে নিষেধ করা হয় না; উহার দ্বারা হাল চাষ করা হয়, উহার গোশত সুখাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঠিক এইরূপেই সুদ ত মানুষ জাতিকে খাইয়া সর্বনাশ করে, আর ব্যবসা জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তাহারা সুদ আর ব্যবসাকে একই রকমের মনে করিত। ইহা পাগলের উক্তি নয় কি? যেরূপ বাঘ ও গরুকে একই পর্য্যায়ের গণ্য করা। তাহারা সাধারণ মানুষের চোখের থেকে সুদের অপকারিতা ও নৃশংসতার দিকটা এবং ব্যবসায় লাভ-লোকসানের চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ ও শ্রমকরণের দিকটা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। ইহাও তাহাদের পাগলামি। এই জন্যই কেয়ামতের মাঠে তাহাদিগকে প্রথমে ত পাগলের আকারে উঠান হইবে, তারপরে যেহেতু সুদের দ্বারা তাহারা লোকের রক্তশোষণ করিত, সেই জন্য অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির নিয়মানুসারে রক্তের নদীর মধ্যে আটক করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

২। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

ধারে ক্রয় বা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যাহার উপর পাওনা থাকে তাহার হইতে লিখিত একরারনামা গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দানে পবিত্র কোরআনের সর্বাধিক দীর্ঘ আয়াত "আয়াতে মোদায়ানাহ" বিদ্যমান আছে (৩ পাঃ ৭ রুঃ)।। উল্লেখিত আয়াত-খণ্ড উহারই অংশবিশেষ। ইহাতে বলা হইয়াছে, ক্রয়-বিক্রয় ছোট হউক বা বড় হউক ধারে হইলে উহা লিখিতে অবহেলা করিও না—"অবশ্য পরস্পর নগদ লেন-দেনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

হইলে" সে ক্ষেত্রে না লেখায় দোষ নাই; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয়কালে সাক্ষী রাখার পরামর্শ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

● পশুর ক্রয়-বিক্রয়ে বয়নামা এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্যাশমেমোর প্রচলন ইহা হইতেই। লেখার ব্যবস্থা অতীতকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে লেখার স্থলে সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছিল; বর্তমানে সাক্ষী অপেক্ষা লেখা সহজ, তাই ক্যাশ-মেমোর প্রচলন হইয়াছে।

৩। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

ব্যাখ্যা ঃ—শুক্রবার দিন জুমার নামাযের প্রতি আহ্বান তথা আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির লিপ্ততা ত্যাগ করতঃ নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়ার আদেশ করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন "অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যাইবে তখন তোমরা এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে এবং আল্লার নেয়ামত উপার্জনে লিপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু এই অর্থ উপার্জনের সময়েও এবং কর্ম-ক্ষেত্রেও অধিক পরিমাণে আল্লার জিক্‌র করিবে, তবেই উন্নতি লাভ করিতে এবং কামিয়াবি হাসিল করিতে সক্ষম হইবে।" (২৮পাঃ ১২রুঃ)

এই আয়াতের দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয়ের তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি, বরং আদেশ প্রমাণিত হইল। কারণ, উহাও আল্লার নেয়ামত উপার্জনের একটি পথ। কিন্তু ইহাও প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা করিতে হইবে। যেমন—জুমার নামাযের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা বন্ধ করার আদেশ করা হইয়াছে। তদুপরি আল্লার জিক্‌র তথা আল্লার আদেশ পালনের প্রতিবন্ধক রূপে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত ও মগ্ন হইবে না।

৪। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের কোন মাল গ্রাস করিও না। হাঁ—পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা তথা ক্রয়-বিক্রয় সূত্রে গ্রহণ কর। (৫ পাঃ ১০ রুঃ)

১০৬১। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলাম তখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লাম আমার এবং মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে রবী'র মধ্যে মোয়াখাত অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করিয়া দিলেন। আমার সেই ভ্রাতা সায়াদ (রাঃ) এরূপ উদার ছিলেন যে, তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমি অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমার ধনের অর্দ্ধাংশ আপনাকে দান করিতেছি। এবং আমার দুই স্ত্রী আছে, আপনি যাহাকে পছন্দ করিবেন আপনার জন্য আমি তাহাকে ত্যাগ করিব, ইদ্দতের পর আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) (ভ্রাতার এই অসীম উদারতার শুকরিয়া আদায় পূর্বক দোয়া করিয়া) বলিলেন—আপনার ধনের আবশ্যক আমার হইবে না; এখানে ব্যবসা কেন্দ্র কোন বাজার আছে কি? ভ্রাতা বলিলেন, 'কায়নুকা' নামক একটি বাজার আছে। ভোর বেলায় আবদুর রহমান (রাঃ) সেই বাজারে চলিয়া গেলেন এবং ঐ দিনের ব্যবসায়ের লাভ দ্বারা কিছু পনির ও ঘৃত ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। এইরূপে প্রতিদিন ভোরে তিনি সেই বাজারে যাইয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলেন। (কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অনেক টাকার মালিক হইয়া এবং টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া বিবাহ করিয়া নিলেন।) একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরে (নব-বধূর ব্যবহৃত) রঙ্গীন সুগন্ধির চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাদী করিয়াছ কি? তিনি উত্তর করিলেন—জী, হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহাকে? তিনি বলিলেন; মদীনার এক মহিলাকে। জিজ্ঞাসা করিলেন—মহরানা কত দিয়াছ? তিনি বলিলেন, এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, একটি বকরি জবেহ করিয়া হইলেও অলিমার (বিবাহের দাওয়াতের) ব্যবস্থা কর।

১০৬২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন--"ওকাজ", "মাজান্নাহ" ও "জুল-মাজায" নামক কয়েকটি প্রসিদ্ধ মৌসুমী বাজার বা মেলা ছিল; (হজ্জের মৌসুমে উহা অনুষ্ঠিত হইত।) অন্ধকার যুগ হইতেই ঐগুলি প্রচলিত ছিল, উহাতে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ইসলামের যুগে ছাহাবীগণ ঐসব বাজারে ব্যবসা করা গোনাহ্ মনে করিলেন। তখন এই আয়াত নাযেল হইল—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা স্বীয় পালনকর্তার নেয়ামত উপার্জনে তৎপর হইবে, (যদিও হজ্জের মৌসুমে হয়) তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না।"

এতদ্ভিন্ন প্রথম খণ্ডের ৯৩ নং হাদীছখানা এস্থানে উল্লেখ হইয়াছে। এই সব হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) দেখাইয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে

ছাহাবীগণ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন এবং কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নাই ; অতএব উহা জায়েযের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহারই আকৃতি সূদ—উহা হারাম।

হালাল-হারামের বাছ-বিচার আবশ্যক

১০৬৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ

অর্থ—আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করার মধ্যে কোন বাছ-বিচার করিবে না—যে, হালাল সূত্রে হাসিল হইল, না—হারাম সূত্রে হাসিল হইল। (নবী (দঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে—তোমরা ঐরূপ হইও না।)

অর্থাৎ কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে, নানা প্রকার অন্যায় ও কুকর্মের সৃষ্টি হইবে। উহার মধ্যে একটি অন্যায় সৃষ্টি হইবে এই যে, মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করায় এতই মোহগ্রস্ত ও লোভ-লালসায় অন্ধ হইয়া পড়িবে যে, হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার করিবে না। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে, তোমরা সেরূপ করিও না যদিও তোমাদের সেই স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় বিশেষ জরুরী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম তিনি বলিয়াছেন, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়া শরীয়তে "হালাল" অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। তদ্রূপ "হারাম"ও অতি সুস্পষ্ট জিনিষ। এই দুইটি পর্যায় ও স্তরের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি পর্য্যায়ও আছে ; উহা হইল—সন্দেহজনক পর্য্যায় ; অর্থাৎ উহাকে হারামও সাব্যস্ত করা যায় না ; সেইরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই, আবার হালালও সাব্যস্ত করা যায় না, উহারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। এই তথ্য প্রমাণে প্রথম খণ্ডের ৪৭ নং হাদীছখানা উল্লেখ হইয়াছে। সন্দেহজনক পর্যায়ের অনেক কিছু ফেকা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যাহাকে শরীয়তে "মকরূহ" বলা হইয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক ক্ষেত্রে ইমাম ও আলেমগণের মতভেদের দরুণও বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুকে সন্দেহজনক সাব্যস্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে দৈনন্দিন এরূপ অনেক কিছু পেশ আসে যাহা সম্পর্কে হালাল বা হারাম হওয়া স্থিররূপে সাব্যস্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) "সন্দেহজনক" হওয়ার সংজ্ঞা নিরূপণেরও চেষ্টা করিয়াছেন

—যাহার সারমর্ম এই যে, সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান থাকে এইরূপ বিষয় ও বস্তুকে সন্দেহজনক পর্য্যায়ের গণ্য করা হইবে। যেমন প্রথম খণ্ডে ৭৪ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—একজন ছাহাবী এবং তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে একটি মহিলা সাক্ষ্য দিল যে, আমি তোমাদের উভয়কে আমার দুগ্ধ পান করাইয়াছি; অর্থাৎ তোমরা উভয়ে দুধ ভাই-বোন; তোমাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। বহু খোজাখুজির পরও এই সাক্ষীর কোন সহযোগী পাওয়া গেল না। ঐ ছাহাবী মক্কা হইতে প্রায় ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর কিভাবে তুমি তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে? ঐ ছাহাবী সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন; অন্যত্র তাহার বিবাহ হইল।

উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী হারাম সাব্যস্ত হয় না। কারণ ঐ মহিলা তাহার দুধ-বোন হওয়ার গ্রহণীয় সাক্ষী ছিল না। দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষের সঙ্গে দুইজন নারী সাক্ষ্যদাতা হইলে উহা হয় গ্রহণীয় সাক্ষী। কিন্তু অসম্পূর্ণ হইলেও ঐ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি সাক্ষী ছিল, এই কারণে তথায় স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় ও দ্বিধা জন্মে—যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত নবী (দঃ) ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

অপর একটি ঘটনা—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমার বিছানার উপর পতিত খোরমা (শুষ্ক খেজুর) দেখিতে পাই, কিন্তু (জানা-শুনা ব্যতিরেকে) উহা আমি খাই না; এই আশঙ্কায় যে, উহা ছদকা-খয়রাতের খোরমা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান আছে যে, ঐ খোরমা ছদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু হযরতের গৃহে ছদকা-খয়রাতের খোরমা আসিয়া থাকিত; হযরত (দঃ) উহা গরীবদিগকে দিয়া দিতেন। নবীর জন্য ছদকা-খয়রাত খাওয়া জায়েয নহে।

আর এক হাদীছে আছে—একদা পথে পতিত একটি খোরমা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা ছদকা হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমি নিজেই উহা উঠাইয়া খাইতাম (যেন আল্লার নেয়ামতের অপচয় না হয়)। এক্ষেত্রেও সংশয়ের স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান আছে যে, উহা ছদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু সচরাচর ছদকা-খয়রাতের খোরমা লইয়া লোকেরা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকিত; তাই ঐ সংশয় ও সন্দেহ স্বাভাবিক।

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, (হারাম হইতে ত বাঁচিতে হইবেই, অধিকন্তু) সন্দেহজনক বিষয় এবং বস্তু হইতেও বাঁচিতে হইবে।

অতঃপর বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, সন্দেহজনক হওয়া এবং অছওয়াছাহ (অমূলক দ্বিধা) ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। উভয়ের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন—সন্দেহজনক

জিনিষ পরিহার করিতে হইবে; অছওয়াছাহজনক জিনিষ পরিহার করার মোটেই প্রয়োজন নাই। উভয়ের পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। সন্দেহজনক বলা হইবে ঐ ক্ষেত্রে যে স্থানে সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান আছে। আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই সেই ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টি হইলে উহাকে "অছওয়াছাহ" বলা হইবে। ইহার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নের হাদীছটিতে উল্লেখ হইয়াছে—

১০৬৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! লোকেরা আমাদের নিকট জবাইকৃত গোশত বিক্রি করার জন্য নিয়া আসে। আমরা জানি না—তাহারা জবেহ করার সময় "বিছমিল্লাহ" বলিয়াছে কি-না। তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বিছমিল্লাহ বলিয়া উহা খাও।

ব্যাখ্যা ঃ—এক্ষেত্রে বিছমিল্লাহ বলা সম্পর্কে সংশয়ের স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই; যেহেতু জবেহ করার সময় মোসলমান ব্যক্তির বিছমিল্লাহ না বলা অস্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার পাত্র "সন্দেহজনক" ও পরিহার্য্য গণ্য হইবে না, বরং "অছওয়াছাহজনক" গণ্য হইবে যাহা পরিহার্য্য নয়, বরং অছওয়াছাহ পরিহার্য্য। পক্ষান্তরে পথে পতিত খোরমা সম্পর্কে ছদকা-খয়রাত হওয়ার আশঙ্কা তদ্রূপ নহে, কারণ ছদকা-খয়রাতের খোরমা লইয়া যেই পথে যাতায়াত ও চলাচল হয় ঐ পথে উহার এক-দুইটি পতিত হওয়া নেহায়েত স্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র "সন্দেহজনক" গণ্য হইবে এবং পরিহার্য্য হইবে। হযরতের বিছানায় পতিত খোরমা সম্পর্কে ছদকা-খয়রাত হওয়ার আশংকাও তদ্রূপই। কারণ, ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য লোকেরা হযরতের গৃহে দিয়া যাইত; এতদ্ভিন্ন লোকদের অনেক অনেক ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণে হযরত (দঃ) বিশেষভাবে জড়িত হইতেন; হযরতের কাপড়-চোপড়ে জড়াইয়া এক-দুইটা খোরমা চলিয়া আসা এবং বিছানায় পতিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, অতএব উহার ভিত্তিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র "সন্দেহজনক" ও পরিহার্য্য গণ্য হইবে। ৭৪ নং হাদীছের ঘটনায় ত সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির কারণটা স্বাভাবিক হওয়া অতি সুস্পষ্ট। সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ায় সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া একটি শরীয়তী বিচারনীতির বিধানগত ব্যাপার, উহা হইলে ত অকাট্য হারামই সাব্যস্ত হইত। অসম্পূর্ণ কিন্তু সুস্পষ্ট সাক্ষ্যে অন্ততঃ সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টি হওয়া ত নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং উহার ক্ষেত্র ত "সন্দেহজনক" এবং পরিহার্য্য সাব্যস্ত হইবেই।

সারকথা এই যে, যেক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক বিষয় হইবে সে ক্ষেত্রকে সন্দেহজনক ও পরিহার্য্য গণ্য করা হইবে, আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক নহে সে ক্ষেত্রকে অছওয়াছাহজনক গণ্য করা হইবে—উহা পরিহার্য্য নহে।

যেরূপ কোন দালানের ছাদ যদি বেশী ফাটা হয়, কড়ি-বরগা বিনষ্ট ও দুর্বল হয় এবং সেই কারণে ছাদ পতিত হওয়ার আশঙ্কা করা হয় এই আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার ক্ষেত্র সন্দেহজনক গণ্য হইবে এবং ঐ গৃহ পরিহার্য্য হইবে। পক্ষান্তরে ছাদ যদি ভাল ও মজবুত থাকে, উহার কড়ি-বরগাও অক্ষত থাকে সে ক্ষেত্রে যদি আশঙ্কা করা হয়—হইতে পারে ছাদ পড়িয়া যায় না কি; এইরূপ আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধা "অছওয়াছাহ" গণ্য হইবে এবং ইহার ক্ষেত্র মোটেই পরিহার্য্য হইবে না।

১০৬৩ নং হাদীছে ব্যবসা-বাণিজ্যে হারামকে পরিহার করার তাকিদ করা হইয়াছে; ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত পরিচ্ছেদ সমূহের ইঙ্গিতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, হারামের ন্যায় সন্দেহজনক ক্ষেত্রকেও পরিহার করিতে হইবে। অতঃপর কতিপয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, হারাম ও সন্দেহজনক ক্ষেত্রকে পরিহার করিয়া সব রকম জিনিসের ব্যবসাই করা যায়। এবং দেশ-বিদেশে এমনকি সুকঠিন সামুদ্রিক ছফর করিয়া বিদেশে যাইয়াও ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। এরই মধ্যে এক পরিচ্ছেদে বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত উল্লেখ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আয়াতটি এই—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۔ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

প্রকৃত ও খাঁটি মোমেনদের একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—"এমন সব লোক যে, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু সেই লিপ্ততা তাহাদিগকে আল্লার জিকর ও আল্লার ইয়াদ হইতে এবং (আল্লার হুকুম পালন তথা) নামায সুষ্ঠুরূপে আদায় করা হইতে, যাকাত প্রদান করা হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনযোগী করিতে পারে না। (বাণিজ্যে লিপ্ততার সময়েও) তাহাদের অন্তরে ভয় জাগ্রত থাকে কেয়ামতের হিসাবের দিনের—সেই দিন ভীষণ আতঙ্কের দরুন মানুষের প্রাণ থর থর কাঁপিতে থাকিবে এবং চক্ষুদ্বয় উলটিয়া যাইবে। (ঐ দিনের অনুষ্ঠান হইবে) এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তায়ালা লোকদিগকে তাহাদের ভাল আমলের পুরস্কার দান করিবেন এবং তাহাদের আমল অপেক্ষাও অধিক দান করিবেন নিজ রহমতে। (নামায, যাকাত আল্লার জিকর ইত্যাদিতে ব্যবসার উন্নতি ব্যহত হয় না; সর্বপ্রকার উন্নতি আল্লাহ তায়ালার হাতে;) আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অসংখ্য ও বে-হিসাবরূপে রিজিক দিয়া থাকেন। (১৮ পাঃ ১১ রুঃ)

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত আয়াতের আলোচনা দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল ও জায়েয বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে—উহা যেন কোন ক্ষেত্রেই আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামায, যাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনোযোগী করিতে না পারে—মোসলমান মাত্রেরই এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ্ (রঃ) বলিয়াছেন, আমরা মোসলমান সমাজের অবস্থা এই পাইয়াছি যে, তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, কিন্তু যখনই তাঁহাদের সম্মুখে আল্লার নির্দেশিত কোন নির্দেশ আসে তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাঁহাদিগকে আল্লার স্মরণ হইতে অমনোযোগী রাখিতে পারে না; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আল্লার নির্দেশ পালন করতঃ উহা আল্লার হুজুরে পেশ করেন।

উক্ত বিবরণের সমর্থনে বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ তফছীরকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা বাজারে ছিলেন; নামাযের জমাত খাড়া হওয়া নিকটবর্তী হইলে লোকেরা নিজ নিজ দোকান-পাট বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ লোকদের প্রশংসায় বলিলেন, এই শ্রেণীর লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়াই কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; এই বলিয়া তিনি উপরোল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। (ফতহুল বারী, ৪—২৩৮)

ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে দান-খয়রাত করা চাই

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ..... وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লার নামে খরচ কর ঐ সব হালাল মাল হইতে যাহা তোমরা কামাই কর এবং ঐ সব হইতে যাহা আমি তোমাদের জন্য জমিন হইতে জন্মাইয়া থাকি। আর উহার নিকৃষ্টটার প্রতি যাইও না যে, আল্লার রাস্তায় খরচ করিতে শুধু নিকৃষ্ট বস্তুই খরচ কর, অথচ ঐরূপ নিকৃষ্ট বস্তু তোমাকে দেওয়া হইলে তুমি একমাত্র চোখ বুজিয়াই উহা গ্রহণ করিতে পার—সন্তুষ্টির সহিত তুমি উহা গ্রহণ করিবে না। স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অপ্রত্যাশী প্রশংসিত। শয়তান তোমাদিগকে ভয় দেখায়—(দান-খয়রাতে) ধন কম হইয়া যাওয়ার এবং তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় অবাঞ্ছিত কাজ করার, আর আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করার এবং রহমত দানের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া থাকেন। আল্লার ভাণ্ডার অসীম এবং তিনি সর্বজ্ঞ।" (৩ পাঃ ৫ রুঃ)

হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! বেচা-বিক্রি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে বেহুদা কথা এবং অনাবশ্যক কসমের অবতারণা হইয়া থাকে; অতএব ব্যবসার সঙ্গে দান-খয়রাতকে জড়াইয়া রাখিও। (মেশকাত ২৪৩)

রিজিক কোশাদাহ হওয়ার আমল

১০৬৫। হাদীছঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ اَوْ يُنْسَاَ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তির আকাঙ্খা থাকে যে, তাহার খাওয়া পরায় স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-সম্পদে প্রশস্ততা লাভ হউক এবং তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার সুনাম বাকি থাকে তাহার কর্তব্য হইবে আত্মীয়দের সহিত সুষ্ঠুরূপে আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলা।

নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা

১০৬৬। হাদীছঃ— عن المقدام ان النبى صلى الله عليه وسلم قال

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ ـ

অর্থ—মেকদাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও জন্য স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য গ্রাস অপেক্ষা উত্তম খাদ্য বস্তু আর কিছু হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর দাউদ (আঃ) নিজ হস্তের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

এখানে ৭৭৩ এবং ৭৭৪ নং হাদীছদ্বয়ও উল্লেখ হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে কোমল ব্যবহার করা উচিত

১০৬৭। হাদীছঃ— عن جابران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى ـ

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সেই লোকের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত যে ব্যক্তি বিক্রয়, ক্রয় এবং স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করা কালে লোকের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

সক্ষম খাতককে সময় দেওয়া

১০৬৮। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতের এক ব্যক্তির রুহ—আত্মা ফেরেশতাগণ কবজ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিশেষ নেক আমল তুমি করিয়াছ কি? সে বলিল, আমি আমার ব্যবসা ক্ষেত্রে সক্ষম খাতকদেরকেও সময় ও অবকাশ দিতাম, তাহার ওজর আপত্তি গ্রহণ করিতাম। আর অক্ষম খাতকদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। এতদ শ্রবণে ফেরেশতাগণও তাহার সহিত তাহার দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য না করার ব্যবহার করিলেন।

অক্ষম খাতককে মাফ করিয়া দেওয়া

১০৬৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهٖ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ

لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

অর্থ—আবু হোয়ায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিল—সে লোকদিগকে বাকী ও ধার দিয়া থাকিত। যদি কোন ব্যক্তিকে দেখিতে যে, তাহার জন্য দেনা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তবে স্বীয় কর্মচারীগণকে আদেশ করিত, এই ব্যক্তিকে মুক্তি ও রেহাই দান কর, এই আছিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে মুক্তি ও রেহাই দিতে পারেন। ফলে সত্যই আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে মুক্তি ও রেহাই দান করিয়াছেন।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সরলতা ও সত্যবাদিতা আবশ্যক গোপন হিলা বা ধোঁকাবাজী করা চাই না

আব্দা ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট হইতে ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ বায়নামা সম্পাদন করিয়াছিলেন: এই এই বিবরণের ক্রীতদাসটিকে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদের পুত্র আব্দার নিকট হইতে ক্রয় করিলেন—মোসলেম ব্যক্তিদ্বয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে—যেখানে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয় দোষ থাকে না, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

● কোন কোন বেপারী ও দালাল ব্যক্তি স্বীয় আস্তাবল (ঘোড়ার ঘর) কে ঐ সমস্ত স্থানের নামে নামকরণ করিয়া রাখিত যে স্থানের ঘোড়া উত্তম ও প্রসিদ্ধ। যেমন কেহ স্বীয় ঘোড়ার ঘরকে 'খোরাসান' বা 'সিজিস্তান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের নামে নামকরণ

করিত ; অতঃপর ঐ সকল আস্তাবল হইতে স্বদেশজাত ঘোড়া সমূহকে বিক্রয় জন্য বাজারে উপস্থিত করিয়া ক্রেতাদিগকে এইরূপে প্রলুব্ধ করিত যে, এই ঘোড়া সবেমাত্র খোরাসান বা সিজিস্থান হইতে আনা হইয়াছে অর্থাৎ এই পশু ঐ প্রসিদ্ধ নামের স্থান হইতে নূতন আমদানী করা হইয়াছে। ক্রেতাগণ এই ঘোড়াকে ঐসব নামের সুপ্রসিদ্ধ দেশ ও স্থানের মনে করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইত ; বস্তুতঃ উহা ঐ দেশ বা ঐ স্থানের নহে, বরং এই নামে নামকৃত বিক্রেতার নিজস্ব আস্তাবল হইতে আনীত দেশী ঘোড়া। এইরূপে ধোকা দিয়া মিথ্যা এড়াইবার ফন্দি করা হইত।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইব্রাহীম নখয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহের নিকট উল্লিখিত উপায় অবলম্বনের মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহাকে অতিশয় জঘন্য ও ঘৃণিত না-জায়েয (হারাম) বলিয়া উক্তি করিলেন।

● ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মানুষের জন্য এরূপ করা জায়েয ও হালাল নহে যে, স্বীয় বিক্রয় বস্তু—পণ্যের মধ্যে দোষ ত্রুটি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সে উহা প্রকাশ না করে।

১০৭০। হাদীছঃ— عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا (فَعَسٰى اَنْ يَّرْبَحَا رِبْحًا وَ) مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

অর্থ—হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা পূর্ণরূপে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া না লয় (জবান না দিয়া ফেলে) তাবৎ উভয় পক্ষের লওয়া-না-লওয়া ; দেওয়া না-দেওয়ার ক্ষমতা ইচ্ছাধীন থাকে। (কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর এক তরফারূপে জবান ফিরাইয়া লওয়ার ক্ষমতা থাকে না—আদান-প্রদান বাধ্যতামূলক হইয়া যায়। এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে) যদি উভয় পক্ষ সততা অবলম্বন করে এবং স্বীয় বস্তুর দোষ ত্রুটি গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় তবে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত ও মঙ্গল হইবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মিথ্যার আশ্রয় নেয় সেই ক্রয়-বিক্রয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত লাভ দেখিবে, কিন্তু উহাতে বরকত ও মঙ্গলের চিহ্নও থাকিবে না।

আলোচ্য হাদীছের উক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী এই মছআলাহ প্রমাণিত হইবে যে, বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর কোন মূল্য নির্দিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু এখনও ক্রেতা উহা গ্রহণ করে নাই,

এমতাবস্থায় বিক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। তদ্রূপ—ক্রেতা কোন মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে বিক্রেতা কর্তৃক উহা গ্রহণের পূর্বে ক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। উভয় পক্ষ হইতে গ্রহণের পরে উহা বাধ্যতামূলক হইয়া যায় এক তরফাভাবে কোন পক্ষ তাহার কথা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না। কিন্তু উভয় পক্ষের একে অপরের কথা গ্রহণ এক বৈঠকে হইতে হইবে, নতুবা নহে—ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী মছআলাহরূপে বর্ণিত হইতেছে।

আলোচ্য হাদীছের অন্য একটি ব্যাখ্যাও করা হয় যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পরেও যাবৎ তাহারা স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথক হইয়া না যায়—কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার স্থানেই বিদ্যমান থাকে তাবৎ উভয় পক্ষের ঐ ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করার ক্ষমতা থাকে।

উল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও ঐ স্থানে থাকা পর্য্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করার ক্ষমতা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এক পক্ষ উহা ত্যাগ করিলে অপর পক্ষ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে উক্ত ক্ষমতা বাধ্যতামূলক নহে বরং সৌজন্যমূলক। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পর উভয় পক্ষ ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, নতুবা মানুষের মুখের বাক্যের কোন মূল্যই থাকে না। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া এখনও বিলম্ব হয় নাই, বরং এখনও উভয় পক্ষ ঐ স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এক পক্ষ ঐ ক্রয়-বিক্রয় হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে অপর পক্ষকে উহা মানিয়া লওয়া উচিত; মানুষের মধ্যে পরস্পর এতটুকু সৌজন্য ভাব বিদ্যমান না থাকিলে 'মানুষ' নামের অবমাননা হইবে।

মছআলাহ ঃ—বিক্রেতা তাহার বস্তুর মূল্য ১০ টাকা বলিয়াছে ক্রেতা আট টাকা বলিয়াছে, বিক্রেতা তাহাতে স্বীকৃতি দেয় নাই, অতঃপর ক্রেতা কথাবার্তার স্থান ত্যাগ করার পর বিক্রেতা ঐ বস্তু আট টাকা মূল্যে প্রদান করিতে রাজি হইয়া তাহাকে ডাকে; এমতাবস্থায় ক্রেতা ঐ বস্তু তাহার স্বীকৃত আট টাকা মূল্যেও গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না। এক পক্ষ কোন মূল্য বলিলে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ মূল্য গ্রহণ করার সুযোগ অপর পক্ষের জন্য শুধুমাত্র ঐ সময় পর্য্যন্ত থাকে যাবৎ উভয় পক্ষ কথাবার্তার স্থানে ও অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ইজাব ও কবুলের পূর্বে কোন পক্ষে ঐ স্থান বা অবস্থা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার (ক্রয়-বিক্রয়ের) সমস্ত কথাবার্তা ও স্বীকৃতি ভঙ্গ হইয়া যায়।

বর্তমানে শহর, বন্দর, হাট-বাজারের দোকানদারগণ এই মছআলাহ জানে না বলিয়া উক্ত অবস্থায় ক্রেতা স্বীয় স্বীকৃত মূল্যে ক্রয় করা প্রত্যাখান করিলে তাহার প্রতি অসৌজন্য বরং জঘন্য ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা নিতান্তই শরীয়তের বরখেলাফ মস্ত বড় অন্যায় ও গোনাহ।

ভাল-মন্দে মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি করা

মছআলাহ ঃ—কাহাকেও ধোঁকা দিয়া নয়, বরং প্রকাশ্যে ভাল-মন্দ মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি করা জায়েয আছে।

১০৭১। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বাইতুল-মাল হইতে) আমাদিগকে ভাতা দেওয়া হইত মিশ্রিত খোরমা। আমরা উহার দুই ধামা (ভাল খোরমা) এক ধামার বিনিময়ে বিক্রি করিতাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এক জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে (পরিমাণে বেশকম করা—) এক ধামার বিনিময়ে দুই ধামা প্রদান করা বা এক দেহরামের বিনিময়ে দুই দেহরাম প্রদান করা জায়েয নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—একই জাতীয় বস্তু ভাল-মন্দের পার্থক্য হইলেও পরস্পর বিনিময়ে পরিমাণের বেশকম করিলে তাহা সুদ ও হারাম গণ্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সমতা রক্ষা করার উদারতা কার্য্যকরী করা না যায় তবে সরাসরি উক্ত বস্তুদ্বয়ের বিনিময় করিবে না, বরং একটাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করিয়া সেই নগদ মূল্য দ্বারা অপরটা ক্রয় করিবে—এই-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন খরিদ-বিক্রয়ের অনুষ্ঠান করিবে। সম্মুখে এই মছআলার বিবরণ আসিতেছে।

সুদ নিষিদ্ধ, বর্জনীয় ও হারাম*

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۔

---

* সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালার অকাট্য বাণী কোরআন শরীফে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত প্রতিনিধি বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত—হাদীছ শরীফে সুদ প্রথাকে স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করতঃ যে সব কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং সুদের পরিণামে যে সব কুফল ও কঠিন শাস্তির বর্ণনা দান করা হইয়াছে, এতদব্যতীত মোসলমান জনসাধারণের অন্তরে সুদের যে ঘৃণ্য রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে সুদের যে বাস্তব রূপ পরিস্ফুটিত ও প্রকটিত হয় মানবীয় জ্ঞানের যুক্তি ও মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত বিজ্ঞানে রচিত শত শত কারণ ও হেতু বর্ণনা করিয়া সুদের সেই বাস্তব রূপের কিয়দংশও প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)